উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত
চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

খামারী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

শ ম রেজাউল করিম এম পি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রাণিসম্পদ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছিলেন, "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশা-আল্লাহ, এই দিন আমাদের থাকবেনা"। বঙ্গবন্ধুর সূচিত পথ ধরে দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত এ উন্নয়ন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এ খাত একদিকে যেমন মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে, অপরদিকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখছে।

দেশের সীমান্তবর্তী এলাকা ও নদীবিধৌত চরাঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার ৪৩টি উপজেলার ৮৬টি সুবিধাবঞ্চিত এলাকা ও ১,০০৪টি নদীবিধৌত চরের দরিদ্র ও বেকার যুবক ও নারীদের প্রাণিসম্পদ পালনে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর সাথে সম্পৃক্তদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। উল্লিখিত প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আওতায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবাদি পশু লালন-পালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ও রোগব্যাধি থেকে প্রাণিদের সুরক্ষা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ম্যানুয়াল প্রণয়ন আবশ্যক। এ বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকল্পের আওতায় খামারি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ম্যানুয়ালটি প্রকল্পের সুফলভোগী, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত এলাকা ও চরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের শুভ সূচনা হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

বিলুপ্ত ছিটমহল ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস, পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় জরুরী কর্মপন্থা গ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে "উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়িত হচ্ছে। ছিটমহল ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলের জনগন প্রকৃতিগতভাবে জীবিকার জন্য কৃষি, মৎস্য ও পশুপাখি লালন পালনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং উক্ত এলাকায় গবাদি পশু-পাখি পালনের জন্য সঠিক খামার ব্যবস্থাপনা, উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তির সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে এটি একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকাবাসীর দারিদ্র বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে, অন্যদিকে ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আমিষের চাহিদা পূরণ করবে। এছাড়া এটি স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর আয় বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষতঃ পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি পালন সুবিধাবঞ্চিত এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বিলুপ্ত ছিটমহল ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলের জনগনের হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি লালন-পালনের প্রাথমিক ধারণা থাকলেও তাদের আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান সীমিত। বিজ্ঞানসম্মত ও লাভজনক উপায়ে গবাদি পশুপাখি পালন করতে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে "খামারি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল" প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

আধুনিক পদ্ধতিতে পবাদি পশু-পাখি লালন পালন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহজবোধ্য ভাষায় জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিলুপ্ত ছিটমহল ও চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী। আমি ম্যানুয়েলটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)

ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহাজাদা
মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নিমিত্তে এবং সুবিধা বঞ্চিত পিছিয়ে থাকা মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" গ্রহণ করেন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের দারিদ্রপীড়িত মোট ১০টি জেলার ৪৩টি উপজেলার ৮৬টি বিলুপ্ত ছিট মহল এবং ১,০০৪টি চরের বেকার, দরিদ্র যুবসম্প্রদায় বিশেষতঃ নারী গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ লালন পালন করে আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র হ্রাস, পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। এছাড়া এটি স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর আয় বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষতঃ পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি পালন সুবিধাবঞ্চিত বিলুপ্ত ছিট মহল ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বিলুপ্ত ছিটমহল ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলের জনগনের হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি লালন-পালনের প্রাথমিক ধারণা থাকলেও তাদের আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান সীমিত। বিজ্ঞানসম্মত ও লাভজনক উপায়ে গবাদি পশু-পাখি পালন করতে হলে এগুলির জাত পরিচিতি, পালন ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয় বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরি ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ সমস্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে "খামারি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল" প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ম্যানুয়েলটি প্রকল্পের সুফলভোগী, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী এবং ক্ষুদ্র ও পারিবারিকভাবে প্রাণিসম্পদ পালনের সাথে জড়িত সকলের উপকারে আসবে। আমি ম্যানুয়েলটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহাজাদা)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	হাঁস পালন	অধিবেশন-১	হাঁস পালনের উদ্দেশ্য ও হাঁসের জাত পরিচিতি	০১
		অধিবেশন-২	হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	০২
		অধিবেশন-৩	হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	০৩
		অধিবেশন-৪	হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা	০৪
		অধিবেশন-৫	বাড়ন্ত হাঁসের ব্যবস্থাপনা	০৫
		অধিবেশন-৬	ডিম পাড়া হাঁসের ব্যবস্থাপনা	০৬
		অধিবেশন-৭	হাঁসের খামারের জীব-নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	০৭
		অধিবেশন-৮	হাঁসের গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয়	০৮-০৯
২.	মুরগি পালন	অধিবেশন-১	মুরগি পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, মুরগি পালনের উদ্দেশ্য, মুরগির জাত পরিচিতি	১০
		অধিবেশন-২	মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	১১
		অধিবেশন-৩	খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা	১২
		অধিবেশন-৪	মুরগির ব্রুডিং, বাচ্চা, বাড়ন্ত ও ডিমপাড়া মুরগি ব্যবস্থাপনা	১৩-১৪
		অধিবেশন-৫	মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করনীয়	১৫-১৬
		অধিবেশন-৬	মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	১৭
		অধিবেশন-৭	মুরগির খামারের জীবনিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা	১৮
		অধিবেশন-৮	সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব	১৯
৩.	ছাগল পালন	অধিবেশন-১	ছাগল পালনের গুরুত্ব ও ছাগলের জাত পরিচিতি	২০-২১
		অধিবেশন-২	ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	২২
		অধিবেশন-৩	ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	২৩
		অধিবেশন-৪	ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা	২৪
		অধিবেশন-৫	ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা	২৫
		অধিবেশন-৬	ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও জীব-নিরাপত্তা	২৬
		অধিবেশন-৭	ছাগলের রোগ ও তার প্রতিকার	২৭
		অধিবেশন-৮	ছাগল খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব	২৮
	ভেড়া পালন	অধিবেশন-১	ভেড়া পালনের গুরুত্ব ও ভেড়ার জাত পরিচিতি	২৯
		অধিবেশন-২	ভেড়ার বাসস্থান	৩০
৪.	ভেড়া পালন	অধিবেশন-৩	ভেড়ার খাদ্যাভাস, খাদ্য উপাদন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৩১-৩২
		অধিবেশন-৪	ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা	৩৩
		অধিবেশন-৫	ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা	৩৪
		অধিবেশন-৬	ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনায় জীব নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ	৩৫
		অধিবেশন-৭	ভেড়ার বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার	৩৬
		অধিবেশন-৮	ভেড়া হতে উল উৎপাদন এবং ৩০টি ভেড়া সমৃদ্ধ খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৩৭

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
৫.	পাঁঠা পালন	অধিবেশন-১	ছাগলের জাত পরিচিতি ও ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের গুরুত্ব	৩৮
		অধিবেশন-২	বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	৩৯
		অধিবেশন-৩	খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৪০
		অধিবেশন-৪	ছাগলের জাত উন্নয়নে বাছাইকরণের ভূমিকা ও কৌশল	৪১
		অধিবেশন-৫	প্রজনন পাঁঠা নির্বাচন	৪২
		অধিবেশন-৬	ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও প্রজনন পাঁঠার যত্ন	৪৩
		অধিবেশন-৭	ছাগলের বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার	৪৪-৪৫
		অধিবেশন-৮	ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও জীব-নিরাপত্তা	৪৬
৬.	বকনা পালন	অধিবেশন-১	গাভী পালনের গুরুত্ব ও জাত পরিচিতি	৪৭
		অধিবেশন-২	বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	৪৮
		অধিবেশন-৩	গাভীর খাদ্য ব্যাবস্থাপনা	৪৯
		অধিবেশন-৪	গরুর জাত উন্নয়ন ও প্রজনন ব্যাবস্থাপনা	৫০
		অধিবেশন-৫	গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা, প্রসবকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা	৫১
		অধিবেশন-৬	বাছুর পালন, বাছুরের পরিচর্যা	৫২
		অধিবেশন-৭	গাভীর রোগব্যাধি ও প্রতিকার	৫৩
		অধিবেশন-৮	রোগ প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা	৫৪
৭.	কবুতর ও কোয়েল পালন প্যাকেজ	অধিবেশন-১	কবুতর ও কোয়েল পালনের গুরুত্ব	৫৫
		অধিবেশন-২	কবুতরের এবং কোয়েলের জাত বা বংশ পরিচিতি	৫৬
		অধিবেশন-৩	কবুতর ও কোয়েলের বাসস্থান এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৫৭
		অধিবেশন-৪	কবুতর ও কোয়েলের গুরুত্বপূর্ণ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ	৫৮
৮.	টার্কি পালন	অধিবেশন-১	টার্কি পালন	৫৯
		অধিবেশন-২	টার্কির জাত	৬০
		অধিবেশন-৩	টার্কির পালন পদ্ধতি	৬১
		অধিবেশন-৪	টার্কির রোগবালাই	৬২
৯.	ঘাস চাষ প্রদর্শনী প্যাকেজ	অধিবেশন-১	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘাস চাষের গুরুত্ব ও জাত পরিচিতি	৬৩
		অধিবেশন-২	উচ্চ ফলনশীল স্থায়ী জাতের ঘাস চাষ পদ্ধতি	৬৪
		অধিবেশন-৩	উচ্চ ফলনশীল জাতের অস্থায়ী / মৌসুমী ঘাস চাষ পদ্ধতি	৬৫
		অধিবেশন-৪	বানিজ্যিভাবে ঘাস চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৬৬
১০.	সাইলেজ প্রদর্শনী	অধিবেশন-১	সাইলেজ প্রদর্শনী	৬৭
		অধিবেশন-২	সাইলেজ তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা	৬৮
		অধিবেশন-৩	মাটির গর্ত পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরি (ব্যবহারিক)	৬৮
		অধিবেশন-৪	ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ ও ড্রাম সাইলেজ তৈরি (ব্যবহারিক)	৬৯

হাঁস পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ হাঁস পালনের উদ্দেশ্য ও হাঁসের জাত পরিচিতি

ক্ষুদ্র খামারে হাঁস পালনের উদ্দেশ্যঃ

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা।
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
- হাঁসের ডিম এবং বাড়ন্ত হাঁস বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে।

হাঁসের জাত পরিচিতিঃ

খাকী ক্যাম্পবেল
উৎপত্তি স্থানঃ ইংল্যান্ড
বৈশিষ্ট্য ঃ

- পালকের রং খাকী।
- ডিমের রং সাদা।
- ঠোট নীলাভ বা কালচে।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ২৫০-৩০০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০-২.৫ কেজি।

খাকী ক্যাম্পবেল

জেনডিং
উৎপত্তি স্থান ঃ চীন
বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং কালো ও সাদা মিশ্রিত
- হাঁসির পালকের রং খাকীর মাঝে কালো ফোটা।
- ডিমের রং নীলাভ।
- ঠোঁট নীলাভ বা হলদে।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ২৭০-৩২৫ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০-২.৫ কেজি।

জেনডিং

পিকিং
উৎপত্তি স্থান ঃ চীন
বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা।
- ডিমের রং সাদা।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৫০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৪.৫ কেজি এবং হাঁসির গড় ওজন ৪.০ কেজি

পিকিং

মাসকোভি
উৎপত্তি স্থান ঃ দক্ষিণ আমেরিকা
বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা ও কালো।
- মাথায় লাল ঝুটি।
- ডিমের রং সাদা।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১২০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৫ কেজি এবং হাঁসির গড় ওজন ৪.০ কেজি।

মাসকোভি

ইন্ডিয়ান রানার
উৎপত্তি স্থান ঃ ভারত
বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা বা বিভিন্ন রংয়ের মিশ্রণ।
- ডিমের রং সাদা।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৮০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি।

ইন্ডিয়ান রানার

অধিবেশন-২ হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান ঃ

- ❖ বাসস্থান এমন জায়গায় হতে হবে যা রোদ, বৃষ্টি ও ঠান্ডা থেকে মুক্ত থাকে। জায়গাটি অবশ্যই খোলামেলা উচু স্থানে হতে হবে।
- ❖ পর্যাপ্ত আলো ও মুক্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকতে হবে।
- ❖ আশ পাশের খামার, বসতবাড়ী ও রাস্তা হতে দূরে খামার স্থাপন করতে হবে।
- ❖ খামারের প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ❖ বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ❖ মুরগীর খামারের সন্নিকটে হাঁসের খামার স্থাপন করা যাবে না।
- ❖ প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমান হাঁসের জাত ও পালন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।
- ❖ আবদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি হাঁসের জন্য সাধারণত ৩-৪ বর্গফুট এবং রান টাইপ পালন ব্যবস্থায় প্রতিটি হাঁসের জন্য ১৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

ঘরের তাপ ঃ ঘরের তাপ ৪.৪ ডিগ্রী সেঃ এর কম বা ৩৭.৮ ডিগ্রী সেঃ এর বেশী হলে তা হাঁসের জন্য ক্ষতিকর। ঘরের তাপ সাধারণত ১২.৮ ডিগ্রী সেঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রী সেঃ পর্যন্ত উত্তম।

ঘরের আদ্রতাঃ হাঁস সাধারণত ৭০% আদ্রতা সহ্য করতে পারে। ঘরের আদ্রতা ৭০% এর উর্দ্ধে হলে ককসিডিয়া ও কৃমির উৎপাত বাড়ে এবং হাঁসকে অস্থির অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

ঘরের আলো (কৃত্রিম) ঃ ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চার জন্য রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে মাঝে মাঝে আলো বন্ধ করে এদেরকে অন্ধকারের সাথে পরিচিত করতে হবে। আলোক সরবরাহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম দেয়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো সরবরাহ উত্তম।

ঘরের বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন) ঃ

দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে ঘরের লম্বালম্বি বেড়ার তারের জালের ব্যবস্থা বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্র ওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘরের লিটার (বিছানা) ঃ লিটার বা বিছানা সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে এমন কিছু লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ধানের খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে উঁচু লিটার (৩"- ৪") ব্যবহার না করে পাতলা লিটার (১"-২") ব্যবহার করতে হবে।

অধিবেশন-৩ হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

হাঁস খামার স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে খামারের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে। কেননা, খামারের ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ এই অংশের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হতে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্যের উপদানসমূহঃ খাদ্যের মৌলিক উপাদান ৬ ধরণের। যথা ঃ শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ ও পানি। শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি); আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল ইত্যাদি); চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট, ভেজিটেবল অয়েল, কর্ড লিভার ওয়েল ইত্যাদি); ভিটামিন জাতীয় খাদ্য (শাকসবজি ও কৃত্রিম ভিটামিন); খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক, ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন ইত্যাদি); এবং পানি।

দেহের ভিতর শর্করা খাদ্য বিশ্লেষিত হয়ে দেহের তাপ উৎপাদনের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ করে। শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান দুই ধরণের। যথাঃ

১। দানাদার ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা, গম, যব, কাওন, সরগম, চাউল ইত্যাদি।

২। আঁশ ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, তোপিওকা, ভুট্টার গুটেন, কাসাভা ইত্যাদি।

হাঁসের প্রতি কেজি খাদ্যে সাধারণত ২৭৫০ থেকে ৩০০০ কি.ক্যালরি শর্করা ব্যবহার করতে হয়।

হাঁসের খাদ্যে প্রাণিজ উৎস ও উদ্ভিদ উৎস হতে আমিষ জাতীয় খাদ্য মিশ্রণ করে তৈরী করা হয়ে থাকে। উদ্ভিদ উৎসের খাদ্য হিসাবে সাধারণত সায়াবিন মিল, তিলখৈল, তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি, ডাকউইড, এ্যাজোলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে প্রাণিজ উৎস হতে সাধারণত শুটকি মাছের গুড়া, প্রোটিন কনসেনট্রেট, শামুক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাঁসের খাদ্যে সাধারণত শুরুতে ২০-২২% এবং ৮ সপ্তাহ বয়সের পর থেকে ১৬-১৭% আমিষ ব্যবহৃত হয়। বাড়ন্ত হাঁস পালণে অধিক আমিষ সরবরাহ করলে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি হয়। তবে এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে। সাধারণত মাংস উৎপাদনে হাঁস পালনে অধিক আমিষ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

হাঁসের খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার গুরুত্ব রয়েছে।

দেহ কোষের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি। খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ অত্যন্ত জরুরী। পানির অভাব হাঁসের উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা কমায়, দৈহিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত করে, রোগ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারের ব্যয় বৃদ্ধি ও লোকসান বৃদ্ধি করতে পারে। পানি খাদ্য বস্তু নরম ও সহজে পরিপাকযোগ্য করে তোলে খাদ্যের পুষ্টি উপাদান দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ, দেহে উৎপাদিত ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ এবং সর্বোপরি খাদ্য বিশ্লেষণ, বিপাক, হরমোন, এনজাইম ও রক্ত তৈরীতে ভূমিকা রাখে।

অধিবেশন-৪ হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। এই বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয়না, এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে সঠিক তাপমাত্রায় পালন পালন করতে হয়। সাধারণত ১ম সপ্তাহে ৯৫ডিগ্রি ফারেনহাইট, ২য় সপ্তাহে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৩য় সপ্তাহে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৪র্থ সপ্তাহে ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ব্রুডিং করতে হয়। ব্রুডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানটি শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি ব্রুডারগার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোবার স্থাপন করতে হবে। হোবারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে। হোবারের অবস্থান উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে ব্রুডারগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

ব্রুডিং ঃ

- ❖ বাচ্চা আসার ৩ ঘন্টা আগেই হোভারের লাইট চালু করতে হবে যাতে ব্রুডারগার্ডের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌছাতে পারে।
- ❖ বাচ্চা খামারে আসার ১ ঘন্টা আগে পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। যাতে পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌছে। পানিতে ০.২৫% গ্লুকোজ (২৫গ্রাম/লিটার) মিশানো যেতে পারে যা দুর্বল বাচ্চাদেরকে সবল করে তুলবে।
- ❖ এবার খামারে আসা বাচ্চার বক্সসমূহ হোভারের নিচে স্থাপন করে কিছুক্ষন (১০ মিনিট) রেখে দিতে হবে যাতে করে বাচ্চার গায়ের তাপমাত্রা ব্রুডিং তাপমাত্রার সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে শুরুতেই বাচ্চার বক্স খামারে প্রবেশের সময় বক্স এর উপর এন্টিসেপটিক স্প্রে করে নিতে হবে এবং বক্সের ওজন নিয়ে রাখা ভালো। এতে করে বাচ্চার গড় ওজন ও গ্রেড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সাধারণত একটি ভালো বাচ্চার গড় ওজন ৩৫-৪৫ গ্রাম হয়ে থাকে।
- ❖ বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় বাচ্চার ঠোঁট পানিতে ছোঁয়াতে হবে। তাতে প্রতিটি বাচ্চাই তার খাওয়ার পানির স্থান চিনতে পারে।
- ❖ খাবার পাত্রে ১ম দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার সরবরাহ না করাই ভালো। কেননা বাচ্চা জন্মের সময় পেটে যে ইয়ক থাকে তা দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে।
- ❖ বাচ্চা আসার পর ১-২ দিন পেপারে ছিটিয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে এবং তার পর থেকে নির্ধারিত খাবার পাত্র বা ট্রেতে খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- ❖ সাধারণত ১ম সপ্তাহে প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র এবং ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ❖ ২য় সপ্তাহ হতে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত প্রতি ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ❖ ৩০ দিন পর হতে প্রতি ৩০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ❖ সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিত নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়বার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়বার সময় হলে ১ম দিনেই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দুসপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়কের কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে। তবে ডিম থেকে ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে এদের পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার কমে যেতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। এ কারণে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করতে হবে। প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- ❖ প্রথম দিন পানিতে গ্লুকোজ মেশাতে হবে।
- ❖ প্রথম দিন ১-২ বার পানিতে বি-ভিটামিন ও স্যালাইন দিতে হবে।
- ❖ ব্রুডারে ছাড়ার পর হতে ১-২ দিন ভূট্টাভাঙ্গা ম্যাস (ছোট আকারের) করে পেপারের উপর ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ❖ ৩য় দিন হতেই খাদ্য খাবার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে।
- ❖ প্রতি বাচ্চা গড়ে ১ম সপ্তাহে ১৫ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ৪০ গ্রাম, ৩য় সপ্তাহে ৭৫ গ্রাম, ৪র্থ সপ্তাহে ৯৫ গ্রাম, ৫ম সপ্তাহে ১ কেজি পর্যন্ত খাদ্য খেতে পারে।
- ❖ প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈনিক ৩-৪ বার খাদ্য দিতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- ❖ খামারে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে।
- ❖ প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পরিমানমত পানি সরবরাহ করতে হবে।
- ❖ পানি বিশুদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে পানিতে ৩ পিপিএম মাত্রার ক্লোরিন প্রয়োগ করতে হবে।

অধিবেশন-৫ বাড়ন্ত হাঁসের ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালীন হাঁসের ব্যবস্থাপনা ঃ সাধারণত ৭-১৯ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কালকে বাড়ন্ত স্টেজ হিসাবে ধরা হয়। তবে ৮ সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিম উৎপাদন পর্যন্ত সময়ই হাঁসের বাড়ন্ত সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসময়ের ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে খামারের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা। বাচ্চার শারীরিক গঠন ১২ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এই সময়ের পরিচর্যার উপর নির্ভর করে ডিম পাড়ার হার।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ বাড়ন্তকালে দিনের আলো ব্যতীত অপরিকল্পিতভাবে রাতে ঘরে আলো প্রদান করলে আগাম যৌন পরিপক্কতা আসবে এবং ডিম পাড়া শুরু হবে। যা পরবর্তীতে ডিম পাড়ার হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- খাদ্য গ্রহনের হার খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুনের উপর নির্ভর করে।
- ঘরের তাপমাত্রা, আদ্রতা, আলোকের পরিমান ইত্যাদি বিষয়ও খাদ্য গ্রহনের হার পরিবর্তন করতে পারে।
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমানে আমিষ ও ক্যালরি থাকতে হবে।
- খাদ্যে সঠিক মাত্রায় অ্যামাইনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবন ও ভিটামিন থাকতে হবে।
- খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে।
- কাঁচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়।
- কোনভাবেই মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না। কেননা, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাল গ্রোথ হবে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে।
- ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- ৬ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয় করে সরবরাহ করতে হবে।
- ব্যাগের মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে।
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

৭-১৯ সপ্তাহ বয়সী বাড়ন্ত হাঁসের খাদ্য তালিকা/রেশন তৈরী (১০০ কেজি) ঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমান (কেজি)
গম ভাঙ্গা	৩৭
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮
চালের গুড়া	১৭
সয়াবিন মিল	২২
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২
ঝিনুক গুড়া	২
ডিসিপি	১.২৫
ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ	০.২৫
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবন	০.৩০
মোট	১০০ কেজি

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- হাঁসের সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে।
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।
- সুযোগ থাকা স্বাপেক্ষে হাঁসকে পানিতে চরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আমাদের দেশে সাধারণত হাঁসকে দিনের বেলা পানিতে চরানো হয় এবং প্রতিদিন সকাল ও রাতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

অধিবেশন-৬ ডিম পাড়া হাঁসের ব্যবস্থাপনা

ডিমপাড়া হাঁস বাছাইয়ে যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো ঃ

- ❖ বাছাইকৃত হাঁসের ওজন প্রায় সমান হতে হবে।
- ❖ সতেজ ও সবল হতে হবে।
- ❖ পালক উজ্জ্বল/চকচকে, নরম ও মসৃণ হতে হবে।
- ❖ চোখ বড়, উজ্জ্বল ও সতেজ হতে হবে।
- ❖ চামড়া পাতলা, নরম ও চর্বিহীন হতে হবে।
- ❖ মলদ্বার বড়, পুরু ও ভেজা হতে হবে।

ঘরের তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা ঃ ডিমপাড়া হাঁসের ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া প্রয়োজন। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ডিম পাড়ার হার কমে যেতে পারে।

ডিমপাড়া হাঁসের খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- ❖ সাধারণত প্রতিটি হাঁস ১ম ৮ সপ্তাহে ৪-৫ কেজি, ১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত ১২-১৩ কেজি খাদ্য খায়।
- ❖ একটি প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস দৈনিক ১৩০-১৫০ গ্রাম খাদ্য খেয়ে থাকে।

ডিম পাড়া হাঁসের আলোক ও ডিমপাড়ার বাসা ব্যবস্থাপনা

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ ডিম পাড়া হাঁস তথা সকল বয়সের হাঁসের আলোক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আলোক ব্যবস্থাপনার সাথে খামারের হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মৃত্যুঝুঁকি, যৌন প্রাপ্তি, দৈহিক গঠন, ডিম উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত। প্রয়োজনীয় আলোক তালিকা সারণিতে দেয়া হলো ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	আলোক সময়কাল (ঘন্টা) (প্রাকৃতিক+কৃত্রিম)	আলোর প্রখরতা (লাক্স)
১-২	২৪	২০-৩০
৩	২৩	২০-৩০
৪	২২	২০-৩০
৫	২১	১০-২০
৬	২০	১০-২০
৭	১৯	১০-২০
৮	১৮	১০-২০
৯-১৯	১২	২০-৩০
২০	১৩	২০-৩০
২১	১৩.৫	২০-৩০
২২	১৪	২০-৩০
২৩	১৪.৫	২০-৩০
২৪	১৫	২০-৩০
২৫-ডিমপাড়া শেষ পর্যন্ত	১৬	২০-৩০

ডিম পাড়ার বাসা ঃ

- ❖ মেঝে বা মাচায় হাঁস পালন করলেও ঘরে সাধারণত ডিম পাড়ার বাসা দিতে হয় না। সাধারণত হাঁস লিটার এর উপর ডিম পাড়ে।
- ❖ হাঁস সাধারণত রাতে এবং সকাল ৯ টার মধ্যেই ডিম পাড়ে।
- ❖ তবে লিটার বা মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে ডিমপাড়ার ১-২ টি বক্স দিলে সুফল পাওয়া যায়
- ❖ প্রতিদিন একই সময়ে একই ব্যাক্তি ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যক্তি খামারে প্রবেশ করতে পারবে না।

অধিবেশন-৭ হাঁসের খামারের জীব-নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

জীব-নিরাপত্তা ঃ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হাঁসে/কাঙ্খিত জীবে অনাকাঙ্খিত জীবাণুর সংক্রমণকে প্রতিহত করা যায়, জীব-নিরাপত্তা বলতে সেই সকল কার্যক্রম গ্রহণকে বুঝায়। খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলোঃ

- খামার বন্য প্রাণী বা অন্যান্য আক্রমনকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে। খামারের প্রবেশপথে ফুটবাথ থাকতে হবে যাতে এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি থাকতে হবে।
- খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী খরচ সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।
- খামারের খাদ্য গুদাম আধুনিক হতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসকে কোয়ারেনটাইন কক্ষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কোন হাঁসের মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে।
- খামারের অভ্যন্তরে পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করা যাবে না। অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পোস্টমর্টেম পরীক্ষা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে করাতে হবে।
- ভেটেরিনারিয়ান ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খামারে ঔষধ প্রয়োগ করা যাবে না। খামারে অল ইন অল আউট পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে।

হাঁসের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ঃ খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যুঝুঁকি রয়েছে। যে সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
২১-২৮ দিন	ডাক প্লেগ
৩৫-৪২ দিন	ডাক প্লেগ বুস্টার, তারপর থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর বুস্টার
৪৫-৬০ দিন	ডাক কলেরা
১৪ দিন পর	ডাক কলেরা বুস্টার তারপর থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর বুস্টার
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে ইডিএস, আইএলটি, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

- খামারে সপ্তাহে ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডি৩ই প্রদান করতে হবে।
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

অধিবেশন-৮ হাঁসের গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয় ঃ

হাঁস তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামারের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবি জনিত রোগ (প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমন), অপুষ্টি জনিত রোগ, বংশগত রোগ ইত্যাদি।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে।

মৃত্যু হার সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে, তবে থাকে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। মাথা, মুখ ফুলে যেতে পারে। পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে।

করণীয় ঃ লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল হাঁস বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টামিনেশন করতে হয়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- ❖ টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- ❖ টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ এ রোগ ফাঙ্গাস সংক্রমণ জনিত রোগ। এরোগে আক্রান্ত হাঁসের ফুসফুসে ফাঙ্গাল গ্রোথ দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক আক্রান্ত থাকলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ❖ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে।
- ❖ বাচ্চা হাঁস একত্রে জড়ো হয়ে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

করণীয় ঃ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- ❖ প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- ❖ শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক মুক্ত হতে হবে।

ডাক কলেরা ঃ এ রোগ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত সেপটিসেমিক রোগ। পাসটুরেলা মালটোসিডা টাইপ এ জীবাণু সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ সবুজ বা হলুদ ডায়েরিয়া। সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অধিক মৃত্যুহার।

করণীয় ঃ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ সঠিক সময়ে টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

ডাক সেপ্টেসেমিয়া/এনাটিপেস্টিপার/নিউ ডাক ডিজিস ঃ এ রোগ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত রোগ। ইহা সেপটেসেমিক রোগ। পাসটুরেলা এনাটিপেস্টিপার জীবাণু সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ❖ অর্থ্রাইটিস, ডায়েরিয়া, শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ ও স্নায়বিক বৈকল্য।
- ❖ ২-৮ সপ্তাহ বয়সী হাঁসে এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়।
- ❖ মৃত হাঁসের ফুসফুসে জমাট রক্ত, স্ফীতাকার যকৃত, স্প্লিনোমেগালি হয়ে থাকে।
- ❖ অধিক মৃত্যু হার।

করণীয় ঃ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে।
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস ঃ এ রোগ ভাইরাস সংক্রমণ জনিত রোগ। ইহা পিকরনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সবুজ পায়খান, চোখ বন্ধ করে রাখে, বসে থাকে ও স্নায়বিক বৈকল্য।
- অধিক মৃত্যু হার।

করণীয় ঃ এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে লক্ষণের উপর ভিত্তি করে সিম্পটোমেটিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ টিকা প্রদান করতে হবে। ৩-১১ সপ্তাহ বয়সে ১ম টিকা এবং ৪ সপ্তাহ পর বুস্টার টিকা প্রদান করতে হবে।

মাইকোটক্সিকোশিস ঃ হাঁসের খাদ্যে ফাঙ্গাল গ্রোথ হলে খাদ্যে টক্সিন তৈরী হতে পারে। টক্সিন যুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে হাঁসে মাইকোটক্সিকোশিস হতে পারে। এ রোগ হলে হাঁসে মৃত্যুহার বাড়তে পারে। মৃত হাঁসের যকৃত ভঙ্গুর হয়, পাকস্থলীতে রক্ত দেখা দিতে পারে। এরোগে এন্টিটক্সিন, টক্সিন বাইন্ডার দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

বটোলিজম ঃ ইহা ক্লোস্ট্রিডিয়াল টক্সিনজনিত একটি রোগ। খাদ্য সংরক্ষণ সঠিক না হলে খাদ্যে প্রোটিন জাতীয় অংশে এনারোবিক কন্ডিশনে ক্লোসট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক ব্যাকটেরিয় বটোলিনাম নামক টক্সিন তৈরী করে। এই টক্সিন হাঁসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়। সাধারণত চিটাগুড় ও পর্যাপ্ত স্যালাইন সরবরাহের মাধ্যমে এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কমানো সম্ভব হয়ে থাকে।

কৃমিজনিত সমস্যা ঃ হাঁসে কৃমি জনিত রোগ প্রায়শই দেখা যায়। সাধারণত গোলকৃমি (এসকারিয়াসিস), গেপ ওয়ার্ম, টেপ ওয়ার্ম জাতীয় কৃমি সংক্রমণ দেখা যেতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

চিত্রে হাঁসের রোগঃ

ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস রোগের লক্ষণ

ব্রুডার্স নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হাসের ফুসফুস

ডাক প্লেগ রোগের লক্ষণ

মুরগি পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ মুরগি পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, মুরগি পালনের উদ্দেশ্য, মুরগির জাত পরিচিতি

মুরগি পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে মোট মুরগির সংখ্যা ৩০৪১.০৬ লাখ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২০-২১ বছরের তথ্য) যা পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি নানাভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

- মাংস ও ডিম ঃ মুরগির মাংস ও ডিম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। সুস্বাস্থ্যের জন্য যে সমস্ত খাদ্য উপাদান মানুষের প্রয়োজন যেমন- আমিষ, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন ইত্যাদি সবই পাওয়া যায় মাংস ও ডিম থেকে।
- কর্মসংস্থান ও আয়ঃ মুরগি পালন হতে পারে কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস।
- বিষ্ঠাঃ মুরগির বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। মুরগির বিষ্ঠায় প্রচুর পরিমান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম রয়েছে যা ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের উপর চাপ বহুলাংশে কমে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রেখে কম খরচে অধিক পরিমানে ফসল ফলানো যায়।
- পালকঃ মুরগির পালকের ব্যবহার আমাদের দেশে খুব একটা প্রচলিত না থাকলেও শীতপ্রধান দেশে পালকের তৈরী লেপ, তোশক, বালিশ ও পোষাক বেশ জনপ্রিয়।

মুরগির জাত পরিচিতি ঃ

জাত ঃ সাধারণ দেশী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর যে সকল মোরগ-মুরগি গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে দেখা যায়, তার প্রায় সবই এ জাতের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি নির্দিষ্ট কোন রংএর অন্তর্ভুক্ত হয় না। লালচে বাদামি বা লালচে কালো রং এর মুরগি বর্তমানে সংখ্যায় বেশী পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রংয়ের মুরগিও আছে। পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে ও কালো রংয়ের। চামড়া হলদেটে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল, বাদামী বা ধূসর। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশী দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন ১.৫ - ২.৫ কেজি এবং মুরগির গড় ওজন ১.২-২.০ কেজি। বছরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৬০-৯০ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ডিমের রং হালকা সাদা থেকে গাড় বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৭৫-৮০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

সাধারণ দেশী মুরগি

জাত ঃ হিলি

প্রাপ্তি স্থান ঃ চট্টগ্রাম এলাকায় বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি অঞ্চলের এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ সাধারণত সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত হয়ে থাকে। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়। দেশী জাতের মুরগি হতে বড় হয়ে থাকে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে, হলুদ এবং কালো রংয়ের। চামড়া হলদেটে। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি। পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.০-৩.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। বছরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ১৩০-১৪০ ডিম দেয়। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৮৫-৯০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

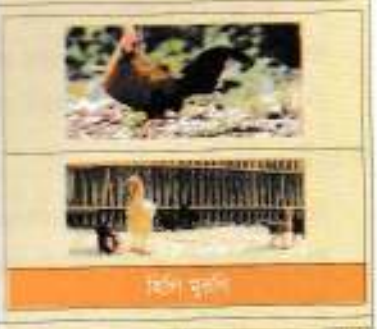

হিলি মুরগি

জাত ঃ আসিল

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সড়াইল এলাকায় এই ধরণের মুরগি দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি গাড় খয়েরী রংয়ের হয়ে থাকে। লোমহীন পা, দেশী মোরগ হতে ওজনে বেশী এবং লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.৫-৪ কেজি এবং ১.৭-২.৫ কেজি। বছরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৩০-৩৫ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।
দৈনিক গড়ে ১৩০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৮-১০ মাস।

আসিল মুরগি

জাত ঃ সোনালী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের মুরগির খামার দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ আর.আই.আর জাতের মোরগের সাথে ফাউমি জাতের মুরগির মিলনের মাধ্যমে সোনালী জাতের মুরগির সৃষ্টি করা হয়। এই জাতের মোরগের গায়ের রং সোনালীর মধ্যে কালো, পাখায় সাদা ফোটা ফোটা। মুরগির গায়ের রং হলুদ কালো। আকারে মাঝারি। ডিমের খোসা ক্রিম বর্ণের। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পরিচিত। এ জাত আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী। পূর্ণ বয়স্ক একটি মোরগ ও মুরগীর ওজন যথাক্রমে ২.০-২.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। এদের বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৫০-২০০ টি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাংস উৎপাদনের জন্য এ মোরগ-মুরগি পালনের পরিমান অধিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সোনালী মুরগি

অধিবেশন-২ মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

মুরগি পালনের ঘর ঃ আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালনের ঘর নানান গোছের ও ধরণের হয়ে থাকে। যেমন- খোলাঘর, দ্বিতল হাইরাইজ ঘর এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর। ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন পদ্ধতি আবার মোটামুটি চার প্রকার। যথা- লিটার পদ্ধতি, মাচা পদ্ধতি, খাচা পদ্ধতি এবং মাচা-কাম-লিটার পদ্ধতি। ঘরের ধরণ ও মুরগি পালন পদ্ধতি, মুরগি সংখ্যা, বয়স, জাতের উপর নির্ভর করে মুরগির ঘরের দৈর্ঘ্য -প্রস্থ নির্ধারিত হবে। মুরগির বাচ্চা সাধারণত ঃ লিটার পদ্ধতিতে পালন করা হয়। এজন্য খোলা ঘরে লিটার পদ্ধতি উচ্চতায় ৬-৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৩-২৪ ফুট এবং ঘরের দৈর্ঘ্য মুরগির সংখ্যার উপর নির্ধারিত হবে এবং ঘরের ছাদ বা ছৈচ্ছা ২.৬" হতে ৩ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি হবে এবং উত্তর-দক্ষিণ দিক খোলা থাকবে। তবে নিচের অংশ ১ হতে ১.৬ বন্ধ থাকবে এবং বাদবাকি অংশ বাঁশ বা জিআই তার দিয়ে নেটের বেড়া দিতে হবে। ঘরের মেঝে আবশ্য অবশ্যই পাকা করে দিতে হবে। তবে মুরগি খামার স্থাপন বা ঘর তৈরির পূর্বে অবশ্যই পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

লিটারে মুরগি পালনের জন্য মুরগি প্রতি ১বর্গফুট এবং খাচায় মুরগি পালনের জন্য মুরগি প্রতি .৭৫ বর্গফুট জায়গা দিলে চলে। মুরগির সংখ্যার উপর নির্ভর করে খামার ঘর তৈরি এবং খাঁচা সংগ্রহ করতে হবে। মুরগির ঘরে প্রচুর আলো বাতাস ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই সূর্যের প্রখর আলো মুরগির গায়ে সরাসরি না লাগে। খাঁচায় মুরগি পালনের জন্য অবশ্যই নতুন খাঁচা সংগ্রহ বা তৈরি করে নেয়া উচিত।

ঘরের আকৃতি/মাপ ঃ যদি ঘরে বায়ু চলাচল ও ব্যবস্থাপনা ভাল থাকে তা হলে পাখি প্রতি মেঝের মাপ হবে সর্বোচ্চ ০.৮ বর্গফুট এবং সর্বনিম্ন ০.৭ বর্গফুট। খামারে মুরগির সংখ্যার উপর নির্ভর করে ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে হবে কিন্তু ঘরের প্রস্থ সর্বোচ্চ ১৫-১৮ ফুটের মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ডিম পাড়ার বাসা ঃ

- মেঝে বা মাচায় মুরগি পালন করলে ঘরে ডিম পাড়ার বাসা দিতে হয়।
- মেঝেতে ডিম পাড়লে মুরগিতে ডিম খাওয়ার বদ অভ্যাস তৈরী হতে পারে।
- মলদ্বারে ঠোকরানোর অভ্যাস তৈরী হতে পারে।
- লিটার বা মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করলে ডিমপাড়ার বক্স দিতে হয়। প্রতি ৪-৫টি মুরগির জন্য বক্সটির আকার ১×১×১.২ (দৈ×প্র×উ) ঘনফুট হতে হবে।
- মুরগি ডিম পাড়া শুরু করার ২সপ্তাহ আগেই বক্স স্থাপন করতে হবে এবং বক্সে আরামপ্রদ দ্রব্যাদি লিটার হিসাবে প্রদান করতে হবে।
- প্রতিদিন একই সময়ে একই ব্যাক্তিকে ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যাক্তি খামারে প্রবেশ করতে পারবে না।

ঘর তৈরী ঃ

- মুরগির বাসস্থান এমন জায়গায় হতে হবে যা রোদ, বৃষ্টি ও ঠান্ডা থেকে মুক্ত থাকে। জায়গাটি অবশ্যই খোলামেলা স্থানে হতে হবে।
- ৫ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ৩.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঘরে ১০-১৫ টি মুরগি পালন করা যায়।
- ১০০০ টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য একটি ঘরের আকার ৪০ ফুট × ২০ ফুট অর্থাৎ ৮০০ বর্গফুট হতে হবে যা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হওয়া বাঞ্চনীয়। ঘরের উচ্চতা ৮-৯ ফুট হলে ভালো। সেমি পাকা এধরনের একটি ঘর তৈরীতে ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হতে পারে।
- মুরগির ঘর বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত উচু জায়গায় স্থাপন করতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো ও মুক্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকতে হবে।
- আশে পাশের খামার, বসতবাড়ী ও রাস্তা হতে দূরে খামার স্থাপন করতে হবে।
- এক খামার হতে অন্য খামারের দূরত্ব কমপক্ষে ২০০ মিটার হওয়া উত্তম।
- আশে পাশে নর্দমা বা ডোবা থাকা যাবে না।
- খামারের প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিষ্টা ও লিটার ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অধিবেশন-৩ খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়োকটির কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে। তবে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার কমতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। একারণে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করে প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- ১ম দিন পানিতে গ্লুকোজ মেশাতে হবে।
- ১ম ১-২ দিন পানিতে বি-ভিটামিন, ভিটামিন- সি ও স্যালাইন দিতে হবে।
- ব্রুডারে ছাড়ার পর হতে ১-২ দিন ভূট্টাভাঙ্গা (ছোট আকারের) পেপারের উপর ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ৩য় দিন হতেই খাদ্য খাবার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে।
- প্রতি বাচ্চা ১ম সপ্তাহে গড়ে দৈনিক ৫ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ১০ গ্রাম এবং তারপর প্রতিসপ্তাহে আরো ৫ গ্রাম বেশী হারে খাদ্য খায়। এভাবে ৮ম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চা দৈনিক গড়ে ৪০ গ্রাম খাবার খায়।
- প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈনিক ৩-৪ বার খাদ্য দিতে হবে। ৩য় সপ্তাহে দৈনিক ৩ বার এবং তার পর থেকে দৈনিক ২ বার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ
- ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- ৯ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয়করে সরবরাহ করতে হবে।
- ব্যাগের মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে।
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান সারণীতে দেয়া হলো ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	শারীরিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি/দিন)
৯	৮২৫	৪৮.০০
১০	৯৫৯	৫১.১৪
১১	১০৮৩	৫৪.৭২
১২	১১৯৩	৫৭.৫
১৩	১৩০৭	৬০.৮৫
১৪	১৪১৭	৬৪
১৫	১৫০৪	৬৭.৫৬
১৬	১৫৯১	৭০.৮৪

বাড়ন্ত ও ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য তালিকা/রেশন (১০০ কেজি) ঃ

খাদ্য উপাদান	৯-১৬ সপ্তাহ	১৭-৭২ সপ্তাহ
	পরিমান কেজি)	পরিমান কেজি)
ভূট্টা	৫৬	৪৬.৫
চালের কুড়া	১৩	১৪.৫
সয়াবিন মিল	৯.৫০	১৪.৯০
গমের ভূষি	৯.৫০	৭.০৫
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.৮০	৭.৬০
ঝিনুকের গুড়া/লাইম স্টোন	১.৪০	৭.০০
ডিসিপি	০.৮০	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০
লবন	০.৫০	০.৫০
মোট	১০০	১০০

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- খামারে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পরিমানমত পানি সরবরাহ করতে হবে।
- পানি বিশুদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে পানিতে ৩ পিপিএম মাত্রার ক্লোরিন প্রয়োগ করতে হবে।
- খামারে পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অধিবেশন-৪ মুরগির ব্রুডিং, বাচ্চা, বাড়ন্ত ও ডিমপাড়া মুরগি ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি চিকগার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোবার স্থাপন করতে হবে। হোবারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে। হোবারের অবস্থান উঁচা-নামা করানোর মাধ্যমে চিকগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি দেশী মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

ব্রুডিং এর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- ঘরের সকল উপকরণ ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে।
- খামারের চারপাশে বাহিরে ৫ ফুট পর্যন্ত চুন ছিটাতে হবে।
- প্রথমে পানি দিয়ে খামারের মেঝে পরিষ্কার করতে হবে, তারপর চুন পাউডার ছিটিয়ে ২৪ ঘন্টা রেখে দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মেঝে পরিষ্কার করতে হবে।
- তারপর জীবানুনাশক ছিটিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালভাবে ঘষে
- পরিষ্কার পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আয়োডিন বা অন্য কোন এন্টিসেপটিকস দিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বাচ্চা আসার ৩-৪ ঘন্টা আগে ব্রুডারের সকল সরঞ্জাম (লিটার, পেপার, হোভার, চিকগার্ড, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, হোভারে বৈদ্যুতিক ভাল্ব লাগানো) নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন ও কার্যকারীতা নিশ্চিত হতে হবে।
- বাচ্চা আসার ৩ ঘন্টা আগে হোভারের লাইট চালু করে চিকগার্ডের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌছাতে হবে।

বাচ্চা মুরগি ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং ঃ

- বাচ্চা খামারে আসার ১ঘন্টা আগে পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। যাতে পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌছে। পানিতে ০.২৫% গ্লুকোজ (২৫ গ্রাম/লিটার) মিশানো যেতে পারে যা দুর্বল বাচ্চদেরকে সবল করে তুলবে।
- খামারে আসা বাচ্চার বক্সসমূহ হোভারের নিচে স্থাপন করে কিছুক্ষণ (১০ মিনিট) রেখে দিতে হবে যাতে করে বাচ্চার গায়ের তাপমাত্রা ব্রুডিং তাপমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে।
- বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় বাচ্চার ঠোঁট পানিতে ছোঁয়াতে হবে।

- খাবার পাত্রে ১ম দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার সরবরাহ না করাই ভালো। বাচ্চা আসার পর ১-২ দিন পেপারে ছিটিয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে এবং তারপর থেকে নির্ধারিত খাবার পাত্র বা ট্রেতে খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- সাধারণত ১ম সপ্তাহে প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র এবং ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে। ২য় সপ্তাহ হতে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত প্রতি ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনায় তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতা ঃ সাধারণত শুরুতে ৯৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে কমাতে হয়। বয়সভেদে ব্রুডিং তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতা নিম্নছকে দেয়া হলো ঃ

বয়স	তাপমাত্রা (ডিগ্রি ফারেনহাইট)	আপেক্ষিক আদ্রতা%
১ম সপ্তাহ	৯৫	৫৫-৬০
২য় সপ্তাহ	৯০	৫৫-৬০
৩য় সপ্তাহ	৮৫	৫৫-৬০
৪র্থ সপ্তাহ	৮০	৫৫-৬০
৫ম সপ্তাহ	৭৫	৬০-৭০

সাধারণত ব্রুডারের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাচ্চা ব্রুডারের হোভারের নিচ থেকে সরে যায় এবং তাপমাত্রা কমে গেলে বাচ্চাসমূহ হোভারের নীচে এসে জড়ো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হোভার উঠা-নামা করে ব্রুডারের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাড়ন্ত মুরগির ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালীন সময়ে গ্রয়িং পুলেট এর ব্যবস্থাপনা ঃ ৮ সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিম উৎপাদন পর্যন্ত সময়ই মুরগির পুলেট স্টেজ।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ বাড়ন্তকালে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন নেই। ১৩ সপ্তাহ বয়স থেকে কৃত্রিম আলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। মুরগির সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে। পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।

ডিমপাড়া মুরগির ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ ডিমপাড়া মুরগি সাধারণত গড়ে দৈনিক ১০০-১১০ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে।

ডিম পাড়া মুরগির আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ ২০ সপ্তাহ থেকে প্রতি সপ্তাহে ০.৫ ঘন্টা করে আলোক সময়কাল বাড়াতে হবে এবং ২৫ সপ্তাহ থেকে দৈনিক ১৬ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মুরগির ঠোঁট কাটা (ডিবিকিং) ঃ মুরগির ঠোঁট লম্বা ও সুচালো হলে মুরগি ঠিকভাবে খাদ্য খেতে পারে না, খাদ্য অপচয় হয় এবং ঠোকরা-ঠুকরির প্রবনতা দেখা যায়। ঠোঁটের অগ্রভাগের ১/৩ অংশ কাটতে হবে এবং সঠিকভাবে কটারাইজ করতে হবে।

অধিবেশন-৫ মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করনীয়

দেশী মুরগি তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামারের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জাতীয় রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবি জনিত রোগ (প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমন), অপুষ্টি জনিত রোগ, বংশগত রোগ ইত্যাদি।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। আমাদের দেশে হাই প্যাথজেনিক ও লো-প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মুরগি মারা যেতে পারে। ❖ মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে। ❖ মাথা, মুখ, ঝুটি ফুলে যেতে পারে। পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে।	করনীয় ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগি বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টামিনেশন করতে হয়। কেননা, এ রোগ মুরগি হতে মানুষে বিস্তার হতে পারে।

ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ ফাঙ্গাস সংক্রমণ জনিত রোগ। শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুঁষ বা কাঠের গুড়া ফাঙ্গাস সংক্রমিত হলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষন না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে। ❖ আক্রান্ত মুরগিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং মারা যায়।	করনীয় ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে তুতে দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রানীক্ষেত ঃ ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। নিউক্যাসল ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এই রোগ এনডেমিক আকারে দেখা যায়। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে। এরোগ ৩ রকমের হতে পারে। যথাঃ রেসপিরেটরি ফর্ম, নার্ভাস ফর্ম এবং ভিসেরাল ফর্ম।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ সাধারণত মুরগি চুনা পায়খানা করে। ❖ মৃত্যু হার অধিক। ❖ মাথা বা ঘাড় বাকা হয়ে যায়, পা অবশ হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়। ❖ ঘাড় বাঁকা হওয়ার কারণে খাবার খেতে পারে না।	করনীয় ঃ এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। পটাশিয়াম - পার - ম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত পানি সরবরাহ করা হলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে। তাছাড়া এ সময়ে রানীক্ষেত টিকা প্রয়োগ করা হলে অনাক্রান্ত মুরগিকে রক্ষা করা যায়।

ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস ঃ ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ মৃত্যু হার অধিক। ❖ মুরগি কাশি দিতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়। ❖ খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে।	করনীয় ঃ লক্ষণ বুঝা গেলে সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস ঃ ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ব্রংকাইটিস ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যে কোন বয়সের মুরগিতে হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ মৃত্যু হার অধিক। ❖ কাশি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়। ❖ খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে।	করনীয় ঃ এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গামবোরো রোগ ঃ ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ/গামবোরো ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত ১৫-২৫দিন বয়সের মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ অত্যান্ত বেশী। এরোগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সহজেই অন্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ মুরগি অবসন্নগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়। ❖ খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে। ❖ রানের ও বুকের মাংসে রক্তের দাগ দেখা দিতে পারে।	করনীয় ঃ এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ইম্যিডস্টিমুল্যান্ট ঔষধ প্রদান করতে হয়। ভিটামিন ক দিতে হয়। তাছাড়া সেকেন্ডারী রোগের সংক্রমণ হতে বিরত রাখার জন্য ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়।

কলিব্যাসিলোসিস ঃ ইহা ব্যাকটেরিয়া জনিত মারাত্বক রোগ। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে তবে বাচ্চা বয়সে এরোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ মুরগি অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়। ❖ খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে। ❖ নরম বা মিউকাস মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হতে পারে।	করনীয় ঃ লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইমিউনস্টিমুল্যান্ট ও স্যালাইন ঔষধ প্রদান করতে হয়।

সালমোনেলোসিস ঃ যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা বয়সে পুলুরাম ডিজিজ এবং ডিম প্রদানের সময়ে সালমোনেলোসিস নামে পরিচিত।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ মুরগি অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়। ❖ খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে। ❖ নরম বা মিউকাস মিশ্রিত হলদে পায়খানা হতে পারে। ❖ ডিম উৎপাদন হার কমে যায়। বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক।	করনীয় ঃ এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইমিউনস্টিমুল্যান্ট ও স্যালাইন ঔষধ প্রদান করতে হয়।

রক্ত আমাশয়/কক্সিডিওসিস ঃ প্রটোজোয়া সংক্রমণ জনিত মারাত্বক রোগ। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা বয়সে রোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ ঃ ❖ মুরগি অবসাদগ্রস্থ, পাখা ঝুলে যায়, শরীর শুকিয়ে যায়। ❖ খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে। ❖ রক্ত মিশ্রিত পায়খানা দেখা যায়। বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক।	করনীয় ঃ লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিপ্রটোজোয়াল ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ❖ লিটার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী (এ রোগের বিস্তার সংক্রমিত লিটার হতে হয়।)

ক্যানাবলিজম/ভেন্ট পিকিং ঃ ইহা মূলত মুরগির বদঅভ্যাসজনিত একটি অবস্থা। এক্ষেত্রে মোরগ-মোরগী একে অপরকে ঠোকরাতে থাকে। কোন মুরগির দেহ হতে কোথাও রক্তপাত হলে ঠোকরানোর পরিমান আরো বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ইহা বদঅভ্যাসে পরিনত হয় এবং খামারের সকল মুরগিতে স্থানান্তরিত হয়।

কারণ ঃ ❖ মুরগির সংখ্যানুপাতে স্থান সংকুলান না হলে। ❖ ঘরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ও আদ্রতা অধিক হলে। ❖ খাদ্যে টক্সিন এর উপস্থিতির কারণে। ❖ খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন, ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ এর অভাবে। ❖ সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ও পানির পাত্র না থাকলে। ❖ ঘরে প্রয়োজন অতিরিক্ত আলোক প্রদান করার কারণে। ❖ টিকা প্রদান ও ডিবিকিং এ দীর্ঘসূত্রতা।	প্রতিকার ঃ ঘরের স্থান অনুযায়ী মুরগির সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে। ❖ ঘরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা ব্যবস্থাপনা ভাল করতে হবে। ❖ খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন, ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ❖ সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ও পানির পাত্র দিতে হবে। ❖ ঘরে আলোক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। ❖ টিকা প্রদান ও ডিবিকিং সঠিক সময়ে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

চিত্রে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ

করাইজা রোগের লক্ষণ

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ

কক্সিডিওসিস রোগের লক্ষণ

মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের লক্ষণ

ক্যানাবলিজম রোগের লক্ষণ

অধিবেশন-৬ মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ঃ খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে। মুরগির সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের (যে সকল রোগের মৃত্যু ঝুঁকি বেশী) টিকা পাওয়া যায়। এসকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই সোনালী মুরগির বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব। মুরগির টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলো ঃ

মাংস উৎপাদনে সোনালী মুরগি সাধারণত ২-৩ মাস বয়স পর্যন্ত পালন করে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
১-৩ দিন	বি. সি. আর.ডিভি
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর.ডিভি

ডিম উৎপাদনে সোনালী মুরগির প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
১ দিন	মারেক্স
৫-৭ দিন	বি. সি. আর.ডিভি
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর.ডিভি
২৮ দিন	ফাউলপক্স
৬০ দিন	আরভিভি/ রাণীক্ষেত
৭০ দিন	ফাউলপক্স
১০৫ দিন	রাণীক্ষেত
১১০ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করাইজা, ইডিএস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

- খামারে সপ্তাহে ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডি৩ই প্রদান করতে হবে।
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

অধিবেশন-৭ মুরগির খামারের জীবনিরাপত্তা ও বর্জ ব্যবস্থাপনা

জীব-নিরাপত্তা ঃ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মুরগিতে/কাঙ্খিত জীবে অনাকাঙ্খিত জীবানুর সংক্রমণকে প্রতিহত করা যায়, জীব-নিরাপত্তা বলতে সেই সকল কার্যক্রম গ্রহণকে বুঝায়।

মুরগির খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলো ঃ

- মুরগির সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে।
- মুরগির বাসস্থান শুকনো স্থানে এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত হতে হবে।
- মুরগির খামার বন্য প্রাণি বা অন্যান্য আক্রমনকারী প্রাণীর হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে।
- খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী খরচ সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।
- খামারে সংগ নিরোধের জন্য কোয়ারেনটাইন কক্ষ রাখা গেলে রোগ ব্যবস্থাপনার বিশেষ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।
- মুরগিকে সঠিক সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত মুরগিকে কোয়ারেনটাইন কক্ষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কোন মুরগির মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে।
- খামারে অল ইন অল আউট পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ খামারে ২টি ব্যাচের মুরগি একই সাথে পালন করা যাবে না।
- খামারের প্রবেশপথে ফুটবাথ থাকতে হবে যাতে এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি থাকতে হবে।
- খামারের অভ্যন্তরে মৃত মুরগির পোষ্টমরটেম পরীক্ষা করা যাবে না। পোষ্টমরটেম পরীক্ষা অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে করাতে হবে।
- ভেটেরিনারিয়ান ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খামারে ঔষধ প্রয়োগ করা যাবে না।

মুরগির খামারের বর্জ ব্যবস্থাপনা ঃ পোল্ট্রি খামার থেকে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। পোল্ট্রি খামার উপজাত, যেমন- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জ্য-লিটার, পোল্ট্রির মলমূত্র, হ্যাচারী বর্জ্য নানাভাবে কাজে লাগানো যায়।

পোল্ট্রির খাদ্য তৈরীতে ঃ এই পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত না হলেও অনেক উন্নত দেশে বহুল ব্যবহৃত ও লাভজনক পদ্ধতি।

- সার হিসেবে ব্যবহার।
- কম্পোস্ট তৈরীতে ব্যবহার।
- বায়োগ্যাস তৈরীতে ব্যবহার।

অধিবেশন-৮ সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব

পারিবারিক মুরগী খামারে ২০ টি সোনালী মুরগি থেকে আয়ঃ ইদানিং সোনালী মুরগি পালনকে অনেকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। এতে সুবিধা অনেক যেমন পুঁজি কম লাগে, অল্প সময়ে অর্থাৎ ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে লগ্নি মূলধন সহ লাভ ফেরত পাওয়া যায় এবং ঝুঁকি তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। এছাড়া যারা নরম ব্রয়লার মুরগির মাংস তেমনটা ভাল বাসেন না এবং যারা একটু রসিয়ে চিবিয়ে মাংস খেতে ভালবাসেন তাদের জন্য এই ছোট সোনালী মুরগি মাংস বেশ পছন্দের। হাইব্রিড বাচ্চা উৎপাদনকারী হ্যাচারিতে সহজে স্বল্প দামে বাচ্চা পাওয়া যায় এবং সরকারি খামারগুলো থেকে সোনালী/ফাওমী জাতের বাচ্চা সংগ্রহ করে পালন করা যায়। সোনালী মুরগি বাচ্চা পালনের লাভজনক দিক তুলে ধরার জন্য একটা সাদামাটা হিসেব এখানে তুলে ধরা হল। প্রতিটি বাচ্চার দাম ১০-১২/-টাকা, ৭-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পালনে খাদ্য ২-২.৫ কেজি যার দাম ৪৫-৫৫/- এবং টিকাবীজ ও আনুসংগিক খরচ বাবদ মোরগ প্রতি ৭/- টাকা মোট খরচ দাঁড়ায় বাচ্চা প্রতি ৬২- ৭৪/- টাকা এর বদলে ৭-৮ সপ্তাহে ৬০০-৭০০/- গ্রাম দৈহিক ওজনের একটি সোনালী মুরগি বাচ্চা পাওয়া যায় যার বাজার দর (বর্তমানে ১০/৫/২০২১) কেজি প্রতি ১৮০/- টাকা হলে ১০৮-১২৬ টাকা। এতে পাখি প্রতি নীট লাভ দাঁড়ায় ৪৬- ৫২/- টাকা যা রীতিমত বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক।

স্থায়ী খরচ ঃ ১। প্রতি বর্গফুট ১৫০/- হিসেবে ২০ বর্গফুটের ১ টি ঘরের মূল্য= ২০০০/- ২। খামারের যন্ত্রপাতি বাবদ খরচ=২০০/- মোট স্থায়ী খরচ= ২২০০/- মোট স্থায়ী খরচের ২৫%=৫৫০/-	চলতি খরচঃ ১। বাল্ব ২ টির মূল্য=৪০০/- ২। থার্মোমিটার ১ টির মূল্য=৩০/- ৩। খাদ্য পাত্র ২ টির মূল্য=১২০/- ৪। পানির পাত্র ২ টির মূল্য=১২০/- ৫। খাদ্য খরচ প্রতিটির ৮ সপ্তাহে ৪০ কেজি (প্রতি কেজি ৪০/-) = ১৬০০/- ৬। বাচ্চার মূল্য=২৪০/- ৭। লিটার বাবদ তুষ ক্রয়=৫০/-বিদ্যুৎ খরচ ২ মাসে = ৫০/- ৮। রোগ প্রতিষেধক, পরিবহন, চিকিৎসা ও অন্যান্য মোট খরচ = ৪০০/- সর্বমোট খরচ = ২৯৬০/-
আয় ঃ ২০ টি সোনালী মুরগি বিক্রি বাবদ আয় = ৩৬০০/- পোল্ট্রি বিষ্ঠা বিক্রি বাবদ আয়=৫০০/- মোট আয়=৪১০০/- নীট আয়=৫৯০/-	

বাণিজ্যিকভাবে ১০০ সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ ১০০ সোনালী মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘরের আকারঃ দৈর্ঘ্য- ১৫ ফুট, প্রস্থ- ১৫ ফুট, উচ্চতা- ৮-৯ ফুট। অর্থাৎ আয়তকার ঘরের আকার ৮০০ বর্গফুট। ঘর পাকা, সেমিপাকা, কাঁচা বা শুধুমাত্র ফ্লোর পাকা হলেও চলে।

খরচের খাত	পরিমান
স্থায়ী খরচ	
ঘর তৈরী (পিলার, পাকা ফ্লোর, টিন, বাঁশ, কাঠ, মিস্ত্রি খরচ, সিলিং ইত্যাদি)	১৫০০০/-
খাবার পাত্র, পানির পাত্র, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ব্রুডার ইত্যাদিসহ আনুসাঙ্গিক ব্যয়	৩০০০/-
মোট	১৮০০০/-
আবর্তক ব্যয়	
১০০ টি বাচ্চা ক্রয় বাবদ @ ১২ টাকা/বাচ্চা	১২০০/-
খাদ্য খরচ ৪ ব্যাগ @ ২০০০/- ব্যাগ	৮০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৫০০/-
ঔষধ ও ভ্যাকসিন খরচ	১০০০/-
আনুসঙ্গিক খরচ	৫০০/-
শ্রমিক মজুরি	৪০০০/-
মোট	১৩২০০/-
সর্বমোট ব্যয়	
স্থায়ী খরচের ১/১০ হিসেবে প্রতি ব্যাচ (একবারের স্থায়ী খরচে ১০ টি ব্যাচ পালন করা যাবে)	১৮০০/-
আবর্তক খরচ	১৩২০০/
প্রতি ব্যাচে মোট খরচ	১৫০০০/-
আয়	
৯৫ টি বাড়ন্ত মুরগি (৫% মৃত্যু ধরে এবং প্রতিটির গড় ওজন ৭০০ গ্রাম হিসাবে এবং প্রতি কেজি মুরগির দাম ৩০০/- হারে) বিক্রয় বাবদ	১৯৯৫০/-
বিষ্ঠা বিক্রয় বাবদ আয়	৫০০/-
মোট আয়	২০৪৫০/-
নীট মুনাফা	৫৪৫০০/-
সঠিক বাজার পাওয়া গেলে এবং নিজস্বভাবে পালন করা গেলে নীট মুনাফা অধিক পাওয়া যায়।	

ছাগল পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ ছাগল পালনের গুরুত্ব ও ছাগলের জাত পরিচিতি

ছাগল পালনের গুরুত্ব ঃ ছাগল আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য হ্রাস, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাগল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য প্রয়োজন হয়। আত্মকর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছাগল হতে পারে একটি অন্যতম হাতিয়ার।

ছাগল পালনের বিশেষ দিকঃ ছাগল পালনের জন্য অল্প জায়গা লাগে এবং মূলধন ও সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল স্বল্প ব্যয়ে ছাগল পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত। ছাগলের মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে। গরুর সংগে মিশ্রভাবে ছাগল পালন করা যায়। গ্রামের বসতবাড়িতে ২-৪ টি ছাগল পালন করা লাভজনক। একটি ছাগল সাধারণত বছরে দুবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গড়ে ২-৪ টি করে বাচ্চা দেয়। দেশে ও বিদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া, মাংস ও দুধের বিপুল চাহিদা আছে। পালনের জন্য ৭-১২ মাস বয়সী সুস্থ ছাগল নির্বাচন করা উচিত।

বাংলাদেশে সচরাচর ছাগলের দু'টি জাত দেখা যায়। এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনাপারী ছাগল। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত খাটো, দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়। এদের কান ছোট, খাড়া ও চুমির সমান্তরাল, শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো, গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি, গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়। যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে। এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে। এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। যমুনা পাড়ি জাতের পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে। যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে। যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয়। এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়। তবুও দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়।

ছাগলের জাত পরিচিতি ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে। দুধ, মাংস ও চুল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ছাগলকে চারটি জাতে ভাগ করা যায়। ১. মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাত, ২. দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত, ৩. চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত, ৪. পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। ব্ল্যাক বেঙ্গল, বোয়ার, দামানি, বিটল প্রভৃতি মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। এ জাতের মাংস অত্যন্ত ভাল মানের। যমুনাপারী, সানেন, অ্যাংলো নুবিয়ান, বারবারি, ব্রিটিশ আলপাইন প্রভৃতি দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। এ জাতের ছাগী হতে প্রতিদিন গড়ে ১-৪ লিটার দুধ পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল, মালাবার, বারবারি, দামাসকাস প্রভৃতি চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত এই শ্রেণির ছাগলের চামড়া দিয়ে উন্নতমানের চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। অ্যাংগোরা, কাশ্মিরী, মেরাডি প্রভৃতি পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। এ শ্রেণির ছাগলের লোম হতে উন্নতমানের দামী পোশাক ও গরম কাপড় তৈরি করা হয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল কালো জাতের ছাগল

চিত্রঃ বোয়ার জাতের ছাগল

চিত্র ঃ মালাবারি জাতের ছাগল

চিত্রঃ সানেন জাতের ছাগল

চিত্রঃ দামানি জাতের ছাগল

চিত্রঃ বিটল জাতের ছাগল

চিত্র ঃ বারবারি জাতের ছাগল

চিত্র ঃ যমুনাপারী জাতের ছাগল

বাংলাদেশের ছাগলের বৈশিষ্ট্য : আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দু'টি জাত দেখা যায়। এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনাপারী ছাগল।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য : ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত খাটো। উচ্চতা ১৬-২০ ইঞ্চি। এদের দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়। এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল। এদের শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি। পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ে ঘটে। ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয়। এ জাতের ছাগল প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর ওলান ছোট।

ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধা : সাধারণত ১২-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় একটি ছাগী বছরে দু'বার বাচ্চা প্রসব করলেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ছাগী থেকে ২-৮ টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। ২০ কেজি দৈহিক ওজন সম্পন্ন একটি ছাগী থেকে কমপক্ষে ১১ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস এবং ১.-১.৪ কেজি ওজনের অতি উন্নতমানের চামড়া পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া একটি অতি মূল্যবান উপজাত। দেখা গেছে, সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ২৫টি ছাগীর খামার থেকে ১ম বছরে ৫০,০০০ টাকা, ২য় বছরে ৭৫,৩৩৭ এবং ৩য় বছরে ১,০২,৬০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

যমুনাপারী ছাগলের বৈশিষ্ট্য : যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে। এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে। এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। সাধারণত ২০-২৫ সে.মি. ঝুলন্ত কান দেখা যায়। ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত। বাটগুলো মোটা ও লম্বা। শরীরের উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি। পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে। এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে। ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দধু দেয়।প্রতি ল্যাকটেশনে এরা সর্বোচ্চ ৬১৮ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়। তবুও দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়।

অধিবেশন-২ ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

ছাগলের ঘর নির্মাণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মাণ করা উত্তম। ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা-লম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল।

ছাগল খামারে যে সকল ঘর থাকা প্রয়োজন ঃ পারিবারিক পদ্ধতিতে এবং মুক্তভাবে ছাগল পালন করলে ছাগলের জন্য আলাদা ঘরের তেমন প্রয়োজন হয় না। মানুষের থাকার ঘরের একপাশে, ঘরের পাশের বারান্দায় অথবা গোয়াল ঘরের গরুর সাথে ছাগল পালন করা হয়। আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে একসাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ঘর তৈরি করতে হয়।

একটি বাণিজ্যিক ছাগল খামারে নিম্নবর্ণিত আলাদা আলাদা ঘর থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

- প্রজনন উপযোগী ও দুগ্ধবতী ছাগলের ঘর, ব্রুডিং পেন
- বাচ্চা ছাগলের ঘর (দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত)
- মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের ঘর (২-৩ মাস বয়স হতে প্রাপ্ত বয়স্ক)
- পাঁঠা ছাগলের ঘর (৩ মাস বয়স হতে সার্ভিসকালীন সময়)
- গর্ভবতী ছাগলের ঘর
- আইসোলেশন শেড (অসুস্থ্য ছাগলের জন্য)
- কোয়ারেন্টাইন শেড (নতুন ক্রয়কৃত ছাগলের জন্য-ক্রয়ের পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত)
- দানাদার খাদ্য রাখার ঘর
- সবুজ ঘাস ও রাফেজ জাতীয় খাদ্য রাখার ঘর।

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণি-বিন্যাস ঃ পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরকে দু'ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে ঃ ক. মেঝে পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে ছাগলকে মেঝেতে পালন করা হয়। খ. মাচা পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে মেঝের উপর মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল পালন করা হয়। নির্মাণ উপকরণের উপর ভিত্তি করে মেঝে পদ্ধতির ঘর তিন রকম হতে পারে– ১. কাঁচা মেঝের ঘর, ২.অর্ধ-পাকা মেঝের ঘর এবং ৩. পাকা মেঝের ঘর।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের ঘরের স্থান নির্বাচন ঃ লাভজনকভাবে খামার করতে হলে ছাগলের জন্য পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উঞ্চ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের পরিবেশ রয়েছে এমন আবাসন প্রয়োজন। অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের বিভিন্ন রোগ বালাই হতে পারে। ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার, দুধ প্রদানের পরিমান এবং বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যায়।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘর নির্মাণ ঃ আয়তনঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে সাধারণতঃ ১৪-১৬ ঘন্টা সময় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়। এজন্য এ পদ্ধতিতে একটি ছাগলের জন্য ৮-৯ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১৬ x১২ বর্গফুট ঘরে ২৪ টি বয়স্ক ছাগল রাখা যায়। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

ঘরের ধরণ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগলকে রাখতে হবে। মাচার উচ্চতা ৫ ফুট হবে এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা হবে ৬-৮ ফুট। গোবর ও পেশাব পড়ার সুবিধার্থে মাচার মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

ঘর ঘরের বিন্যাস ঃ বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখা উচিৎ। পাঁঠাকে সবসময় ছাগী হতে পৃথক রাখা উচিৎ। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। ছাগল ছানাকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত মা ছাগীর সাথে রাখা উচিৎ। বাড়ন্ত ছাগল ও খাসীকে একসাথে রাখা যেতে পারে তবে তাদেরকে পৃথকভাবে খাওয়াতে হবে।

ব্রুডিং পেন ঃ বাঁশের খাঁচা বা কাঠের খাঁচাকে ব্রুডিং পেন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর চারপাশ ছালা বা চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকবে। খাঁচার মেঝেতে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকবে। ৬০ x৫৬ x ৬০ ঘন সে.মি. আয়তনের ব্রুডিং পেনে ২ টি ছাগীসহ ৪-৬ টি বাচ্চা রাখা যায়। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে খাঁচা প্রতি ১ টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায়।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস : ছাগল রোমন্থক প্রাণী। ছাগল সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে। এ ছাড়া ছাগল সংকটকালে নাইট্রোজেন ও পানি অধিকতর ভালভাবে শরীরের কাজে লাগাতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্যের অভাব হলে ছাগল অত্যন্ত নিম্ন পুষ্টিমানযুক্ত খাদ্য খেতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণি খায় না। ছাগল সাধারণতঃ কাঁঠাল, আম, কলা, তুঁত, গামারী, মেহগিনি, বট, বরই, ভুট্টা, সূর্যমুখী প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দূর্বাঘাস, লতা, গুল্ম, কাটা-ঝোপ এবং বাড়ির শাক-সবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে ছাগল তার খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। ছাগলকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে এবং অধিক উৎপাদন পেতে হলে একে নিয়মিত সুষম খাদ্য খাওয়ানো উচিৎ। অধিক দুধ ও মাংস এবং উন্নতমানের চামড়া উৎপাদনের জন্য ছাগলকে সম্পূরক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছাগলের ওজন (কেজি)	দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)	দৈনিক ঘাস সরবরাহ/ চরানো (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
> ১৮	৩৫০	২.০

দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছাগীর ওজন (কেজি)	দুধের পরিমান (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস/পাতা (কেজি)	খড় (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫	-	১.০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৫০০	২.০
৪০	১.০০	৪০০	২.৫	৬৫০	২.০

বিভিন্ন ওজনের খাসীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩	৬.০	০.৪০	০.০২	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫	০.০৫	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০	০.০৫	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০	০.১০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০	০.১৫	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০	৩০০	৪০০

ট্রল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো : ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এ খাদ্যের মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুড়া, ভূষি, চাল, ডাল, ছোলা ইত্যাদি) থাকতে হবে। একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

টেবিল : ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

উপাদান	শতকরা হার
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
গমের ভূষি/আটা/ কুড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকালাই/অন্য ডালের ভূষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা প্রভৃতির খৈল	২০.০০
শুটকি মাছের গুড়া	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবন	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
মোট	১০০

ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা, দুগ্ধবতী ছাগল ব্যবস্থাপনা

বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পূর্বে ব্যবস্থাপনা:

- ❖ যেসব বাচ্চা দুর্বল উক্ত খড় তাদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি মাল্টিভিটামিন, মিনারেল ও পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ❖ দুধ বন্ধ করানোর পূর্বেই বাচ্চাকে দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাবারের সাথে অভ্যস্থ করাতে হবে।
- ❖ যেসব বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয় সকল পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো যাবে না।

ক্ষুদ্র খামারে বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো (Weaning):

- ❖ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যে দুধ ছেড়ে দেয়।
- ❖ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ৩-৪ মাস বয়সে সাধারণত ৩-৪ কেজি ওজন হয়। এই সময় তাদের ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম করার শক্তি পুরোপুরি হয় না। পাঁঠা বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর থেকেই আলাদা রাখতে হবে।

ক্ষুদ্র/পারিবারিক খামারে দুগ্ধবতী ছাগলের ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধদোহন

- ❖ ভাল ব্যবস্থাপনায় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বাচ্চাকে খাওয়ানের পরও দৈনিক ৫০০-১০০০ গ্রাম দুধ দিতে পারে।
- ❖ যেসব ছাগী পর্যাপ্ত দুধ দেয় তাদেরকে দুধ দোহন করলে দুধের উৎপাদন বেড়ে যায়।
- ❖ দুধ দোহানের পূর্বে দুই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পাত্রে দুধ দোহানো উচিত।
- ❖ ওলানকে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার গামছা বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছা উচিত।
- ❖ দুধ দোহানোর সময় বাঁটের গোড়ায় আটকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে বাঁটের সম্পূর্ণ দুধ বের করতে হবে।

ছাগল ছানার কলস্ট্রাম ও দুধ খাওয়ানো ঃ জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে কলস্ট্রাম বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে। প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগল ছানাকে ১৫০-২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধ খাওয়াতে দেরি হলে হজমে সমস্যা হয়।

জন্ম হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত হারে খাদ্য প্রদান করা উচিৎ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমান	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমান	কাঁচা ঘাস
০-২	২০০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৩-৪	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৫-৬	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমান
৭-৮	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৯-১০	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
১১-১২	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। এতে বাচ্চার পুষ্টি ঘাটতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত মিশ্রণ অনুযায়ী মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো যায়।

উপাদান পরিমান	পরিমান (%)
ননী মুক্ত গুড়া দধু (স্কিম মিল্ক) পাউডার	৭০
চাল, গম বা ভুট্টার গুড়া	২০
সয়াবিন তেল	৭
লবণ	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয় ভাগ উষ্ণ (৩৯-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতি ঃ সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়। ছাগলকে দিনের বেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশে খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা হয়।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের ঘর ঃ স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ১০ বর্গ ফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন হয়। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরি হতে পারে।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা ঃ এক মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মা ছাগীতে দুধ কম থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগীর দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া ছাগীর দুধ পাওয়া না গেলে বিকল্প দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়াতে হবে। এক হতে দেড় কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে। বাচ্চার ১ মাস বয়স হতে ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করাতে হবে।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো ঃ ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘাস ও খড় খাওয়ানোঃ স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠাকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করা প্রয়োজন। ঘাস পাওয়া না গেলে খড়কে ২-৩ ইঞ্চি পরিমান কেটে ইউরিয়া মোলাসেস দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

অধিবেশন-৫ ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয়। বাছাই ক্রিয়ার সময় নিম্নের প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	উৎপাদন বৈশিষ্ট্য	পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য
দৈহিক বৃদ্ধির হার	ছাগল প্রতি মাংস উৎপাদন	বয়োঃসন্ধির বয়স
যৌন পরিপক্কতায় আসার বয়স ও ওজন	ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ	প্রথম প্রজননে আসার বয়স ও ওজন
জন্মকালীন বাচ্চার ওজন	চামড়ার গুণাগুণ	প্রথম গর্ভধারণের সময় বয়স ও ওজন
দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন	দুধ উৎপাদন	প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স
দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার	লোম উৎপাদন	কিডিং ইন্টারভ্যাল
	গুণগত মান	প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা
		পাঁঠার শুক্রাণুর গুনগত মান

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন ঃ প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ❖ বয়স কমপক্ষে ১২ মাস বা তার বেশি হতে হবে।
- ❖ শারীরিকভাবে সুস্থ এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হবে।
- ❖ রুক্ষ, আক্রমনাত্মক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হবে।
- ❖ পিতা-মাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে।
- ❖ অণ্ডকোষ বড় ও সুগঠিত হবে। পেছনের পা মজবুত ও শক্তিশালী হবে।
- ❖ অবশ্যই সকল প্রকার যৌন রোগ হতে মুক্ত থাকবে।

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন ঃ প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ❖ বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে। দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে।
- ❖ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের মাংসবহুল ছাগী নির্বাচন করতে হবে।
- ❖ দুধ উৎপাদনকারী জাতের হলে ওলান ও বাঁট বড় ও সুগঠিত হবে।
- ❖ পিতা-মাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে।
- ❖ দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি এমন ছাগী নির্বাচন করতে হবে। ছাগী অবশ্যই শান্ত প্রকৃতির হবে।

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ ঃ

- ❖ ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায়।
- ❖ খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয়।
- ❖ মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে।
- ❖ সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে। অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয়।
- ❖ ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার লাল হয় এবং ফুলে যায়।
- ❖ যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয়।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ ঃ

- ❖ ছাগী গরম হওয়ার ৮ - ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয়।
- ❖ প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা যায়। সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে।
- ❖ বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ছাগী পুনরায় গরম হয়।
- ❖ ছাগীকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধিবেশন-৬ ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও জীব-নিরাপত্তা

রোগ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম। রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, আবার কখনও কয়েক বছর হতে আজীবন কাল হতে পারে।

ভ্যাকসিনেশনের সাধারণ নিয়মাবলী এবং সতর্কতা ঃ ১) সুস্থ প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে। অসুস্থ প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করা নিরাপদ না। ২) পরজীবী আক্রান্ত প্রাণিতে ভ্যাকসিন ভাল কাজ করে না। তাই ভ্যাকসিন প্রয়োগের পূর্বে প্রাণিকে পরজীবি মুক্ত করে নিতে হবে। ৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ভাল কোম্পানী হতে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। ৪) ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার করতে হবে। পুকুর, নদীনালা, ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করলে ভ্যাকসিনের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৫) পানিতে গুলানো ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে (গুলানোর সর্বোচ্চ ১ ঘন্টার মধ্যে)। ৬) ভ্যাকসিন নির্দেশনানুযায়ী তাপমাত্রায় সংরক্ষন করতে হবে। পরিবহনের সময় থার্মোফ্লাস্কে পরিবহন করতে হবে। ৭) দুটি ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মধ্যবর্তী বিরতিকাল কমপক্ষে ২ সপ্তাহ হবে। ৮) গর্ভবতী ছাগলকে জিটিভি দেয়া যাবে না

ভ্যাকসিন প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন ধরণের ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকের নির্দেশনানুযায়ী শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত যে সকল পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় - ১) মাংসপেশীতে ইনজেকশন, ২) চামড়ার নিচে ইনজেকশন, ৩) শিরায় ইনজেকশন, ৪) খাদ্য বা পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ, ৫) স্প্রে বা আরোসলের মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে শ্বাস -প্রশ্বাসের সাথে এবং ৬) চোঁখে ড্রপ, মুখে খাওয়ানো ইত্যাদি।

ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার কারণ ঃ ১) ভ্যাকসিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে। ২) অসুস্থ প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করলে। ৩) প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে কিংবা রক্ত-শুন্যতায় ভুগছে এমন প্রাণিকে ভ্যাকসিন করলে। ৪) ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার না করে অনিরাপদ পানি ব্যবহার করলে। ।৫) ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত না হলে। ৬) প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত মাত্রায় ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা না হলে।

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণ ঃ

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী ডোজ	প্রয়োগের স্থান	মাত্রা/পরিমান
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
জলাতঙ্ক টিকা	৩ মাস	৬মাস পরপর	চামড়ার নিচে	মনো-১মিলি, বাই-২ মি.লি, ট্রাই-৩মিলি
গোট পক্স টিকা	৪ মাস	৬ মাস পরপর	চামড়ার নিচে	১মিলি
জলাতংক টিকা (রেবিসিন)	৪ মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া না হলে) ৯ মাস মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া হলে)	১ বছর পর	চামড়ার নিচে/ মাংসপেশীতে	১মিলি
আনথ্রাক্স টিকা	৪ মাস	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	০.৫ মি.লি
গলাফুলা টিকা	৬ মাস	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	২মিলি
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে		মাংশে	১মিলি
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন (১ম ডোজ),	১০-১৪ দিন (২য় ডোজ) ৩ মাস (৩য় ডোজ) ১২ মাস (পরবর্তী ডোজ)	উৎপাদনকারীর নির্দেশনামত	

জীব-নিরাপত্তা ঃ খামার এলাকার বেড়া বা নিরাপত্তা বেষ্টনী এমন হবে যাতে সেখানে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি, শেয়াল-কুকুর ও বণ্যপ্রাণি প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশ পথে ফুটবাথ বা পা ধোঁয়ার জন্য ছোট চৌ-বাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের আগে খামারে গমনকারী তার জুতা/পা ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করবেন। খামারের জন্য সংগৃহীত নতুন ছাগল সরাসরি খামারে পূর্বের ছাগলের সাথে রাখা যাবে না। স্বতন্ত্র ঘরে অন্তত ঃ দুই সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে বহিঃপরজীবি এবং অন্তঃপরজীবীর জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোনো রোগ না দেখা দেয় তাহলে প্রথমে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন এবং সাত দিন পর গোটপক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। শেষ টিকা প্রদানের সাত দিন পর এসব ছাগলকে মূল খামারে নেয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সকাল এবং বিকালে ছাগলের ঘর পরিষ্কার করতে হবে। কোনো ছাগল অসুস্থ হলে তাকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে। যদি কোনো ছাগল মারা যায় তবে অবশ্যই তার কারণ সনাক্ত করতে হবে। মৃত ছাগলকে খামার থেকে দূরে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের ব্যবহার্য সকল সরঞ্জামাদি ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

ছাগলের বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার

ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস (Mastitis) ঃ এ রোগে ছাগীর ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়, দুধ দোহন করলে পাত্রে দুধের তলানি পড়ে, দুধ উৎপাদন কমে যায়, দুধের স্বাদ লবণাক্ত হতে পারে, তীব্র প্রকৃতির রোগে ওলানের ভিতর পুঁজ হয়। পরে দুধের সাথে রক্ত আসে ও দর্গন্ধ হয়। ওলান ও বাটে ব্যাথা হয় দুধ দোহন করতে বা বাচ্চাকে টেনে খেতে দিতে চায় না। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। দুধ দোহনের সময় হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রয়োজনে সাবান বা ক্লোরিন সলিউশন ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় ছাগল ছানাকে ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া যাবে না।

ধনুষ্টংকার/টিটেনাস ঃ যে কোন অপারেশন, খাসীকরণ, বাচ্চা প্রসবের সময় ছাগীতে বা ছাগল ছানার নাভীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে তখন টিটেনাস রোগ হয়। আক্রান্ত ছাগলের চোয়াল, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ির মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দাঁত লেগে যায় বলে ছাগল খেতে পারে না। খিচুনি দেখা যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে, প্রথম দিকে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং শেষ দিকে তাপমাত্রা কমে যায়, দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে যায়, পা ও ঘাঁড় শক্ত হয়ে যায় বলে আক্রান্ত ছাগল চলাফেরা করতে পারেনা এমনকি দাড়াতেও পারেনা। তীব্র আক্রান্ত ছাগল কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।

একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী টিটেনাস আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য (১) খোঁজাকরণ, নাড়ি কর্তন, লোম কাটাসহ যে কোন ধরণের অপারেশনের সময় ছাগলকে টিটেনাস টক্সয়ড/এন্টি টিটেনাস সিরাম ইনজেকশন করতে হবে। (২) ডেটল, সেভলন প্রভৃতি এন্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। (৩) এক বছর পরপর দু'বার ছাগীকে এন্টিটিটেনাস সিরাম/টিটেনাস টক্সয়ড ইনজেকশন প্রদান করতে হবে।

তড়কা/এ্যানথ্রাক্স ঃ আক্রান্ত ছাগল লক্ষণ প্রকাশের আগেই অনেক সময় মারা যায়। ছাগল টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাপাঁতে থাকে, খিচুনি দেখা যায় এবং মারা যায়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৩-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট), খাওয়া ও জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়, শ্বাসকষ্ট হয়, নাক মুখ দিয়ে লালা পড়ে, পেট ফুলে ওঠে, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয়। মরা ছাগলের নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয়।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য (১) মৃত ছাগল ও মৃত ছাগলের ব্যবহৃত সকল জিনিস পুড়িয়ে বা মাটির গর্তে বা চুন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না। (২) আক্রান্ত প্রাণি বা মৃতদেহ কোন অবস্থাতেই ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না। (৩) লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত প্রাণিকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে। (৪) অসুস্থ্য ছাগলকে বিক্রি করা যাবে না। অসুস্থ্য ছাগলকে এক স্থান স্থানান্তর করা যাবে না। (৫) সুস্থ্য ছাগলকে ১ বছর পর পর এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

এন্টারোটক্সিমিয়া ঃ পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যবস্তু এ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। আক্রান্ত ছাগল শরীরের ভার বহন করতে পারে না, চারণ-ভূমিতে হাটতে হাটতে কাপঁতে থাকে, খিচুনি দেখা যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, পেট ফুলে উঠে, ডায়রিয়া হয়। তীব্র প্রকৃতির রোগে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে মারা যায়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে।

ক্ষুরারোগ ঃ ক্ষুরারোগ ছাগলের একটি ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। এ রোগে মৃত্যুর হার কম হলেও উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আক্রান্ত ছাগীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, গর্ভবতী ছাগীর গর্ভপাত হয়, শরীরে কাপটুনি দিয়ে জ্বর আসে, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখের ভিতরের পর্দায়, জিহ্বায়, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের ফাঁকে এমনকি ওলানে ফোস্কা পড়ে। ছাগল খেতে পারে না। ক্ষুরে ঘা হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে। ক্ষতে মাছি ডিম পাড়লে পোকা হতে পারে। বাচ্চা ছাগলে এ রোগ হলে হার্ট আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

কুসুম গরম পানিতে ফিটকিরি বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে মুখের ও পায়ের ঘা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে রোগাক্রান্ত ছাগলের মল মূত্র, বিছানা ও ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মৃত ছাগলকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

পিপিআর ঃ পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক রোগ। আক্রান্ত ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে এবং নাকের ভিতরে শ্লেষ্মা জমে যায়, পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া দেখা দেয়, জিহবা, দাঁতের মাড়ি, মাজল ও মুখের ভিতর ঘা হয়, মলের রং গাঢ় বাদামী হয় এবং মলের সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মিশানো মিউকাস আসে। শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। চিকিৎসায় বিলম্ব হলে ৫-১০ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ ঃ আক্রান্ত ছাগলের নাক ও মুখের চারদিকে ফুঁসকুড়ি হয়। ঠোঁট ও মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতের জন্য ঠোঁট ফুলে যায়। চোখ, ওলান, মলদ্বার ও পায়ের খুরের উপরের চামড়ায় ফুঁসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আক্রান্ত ক্ষত ফিটকিরি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

গোটপক্স ঃ গোটপক্স হচ্ছে ছাগলের একটি অন্যতম মারাত্মক ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ। আক্রান্ত ছাগলের জ্বর হয়। চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে। আক্রান্ত ছাগলের সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে। মুখের চারপাশে, নাকে, মাজলে, মুখের ভিতরে দাঁতের মাড়িতে, কানে, গলায়, ওলানে ও বাঁটে পশম কম এমন জায়গায় বসন্তের গুটি বা ফোস্কা দেখা যায়। আক্রান্ত ক্ষতে এন্টিবায়োটিক পাউডার বা কর্টিসোন ক্রিম লাগানো যেতে পারে। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ্য ছাগলকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। সুস্থ্য ছাগলকে গোট পক্স টিকা প্রদান করতে হবে।

অধিবেশন-৮ ছাগল খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

খামারে ছাগলের সংখ্যা

বছরের শুরুতে	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
ছাগী	৫	৫	১০	১২	১২
পাঁঠা	১	১	১	২	২
বাড়ন্ত ছাগল (পুরুষ)		৩	৪	৯	১৪
বাড়ন্ত ছাগল (মহিলা)					
বাচ্চা (পুরুষ)		৫	৬	১২	১৪
বাচ্চা (মহিলা)		৫	৬	১২	১৪
মোট	৬	১৯	২৭	৪৭	৫৬

বছর শেষে	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
ছাগী	৫	৭	১২	১২	১২
পাঁঠা	১	১	২	২	২
খাসী		৭	৯	২০	২৭
বাচ্চা (পু) (০-৬ মাস)	৫	৬	১২	১৪	১৪
বাচ্চা (ম) (০-৬ মাস)	৫	৬	১২	১৪	১৪
বাড়ন্ত ছাগল (পুরুষ)	৩	৪	৯	১৪	১৪
বাড়ন্ত ছাগল (মহিলা)	৩	৪	৯	১৪	১৪
মোট	২২	৩৫	৬৫	৯০	৯৭

বিক্রয় থেকে আয়	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
খাসী		৫০৭৫০	৭০৮০০	১৫০৩২৫	২০৫৪০০
বাড়ন্ত ছাগল (মহিলা)	১৬০০০	২৭০০০	৬৮১০০	১৫১৫০০	১৬৪৩০০
জৈব সার	৪৫০০	৬০০০	১৩০০০	১৭০০০	২০০০০
মোট	২০৫০০	৮৩৭৫০	১৫১৯০০	৩১৮৮২৫	৩৮৯৭০০

খরচ	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
বাসস্থান	১৫০০০				
ছাগল ক্রয়	৩৩০০০				
খাদ্য	১৩০০০	৩০০০০	৪৫০০০	৬০০০০	৬৮০০০
ঔষধ, শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা	১৫০০০	৪০০০০	৬০০০০	৮০০০০	৯৫০০০
মোট	৭৬০০০	৭০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	১৬৩০০০

লাভ	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
	৫৫৫০০-	১৩৭৫০	৪৬৯০০	১৭৮৮২৫	২২৬৭০০

খামারের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

বছর	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
ছাগলের ঘরের জায়গা (বর্গফুট)	৮০	১৮৫	৩০৬	৫১৪	৫৮০
উন্মুক্ত জায়গা (বর্গফুট)	১৬০	৩৭০	৬১২	১০২৮	১১৬০
মোট খামারের জায়গা (বর্গফুট)	২৪০	৫৫৫	৯১৮	১৫৪২	১৭৪০
দানাদার খাদ্য রাখার জায়গা (বর্গফুট)	১৭	৪০	৬৬	১১০	১২৪
হে ও খড় রাখার জায়গা (বর্গফুট)	২২	৫২	৮৭	১৪৭	১৬৫
ছাগলের ঘরের জায়গা (শতাংশ)	০.৬৬	১.৫৩	২.৫৪	৪.২৬	৪.৮২
উন্মুক্ত জায়গা (শতাংশ)	১.৩২	৩.০৬	৫.০৮	৮.৫২	৯.৬৪
মোট খামারের জায়গা (শতাংশ)	১.৯৮	৪.৫৯	৭.৬২	১২.৭৮	১৪.৪৬
ঘাসের জমি	৬.৮	১৫.৮৪	২৬.২	৪৪.০৫	৫০
ছাগলের ঘরের জায়গা (বর্গফুট)	৮.৮	২০.৪৩	৩৩.৮২	৫৬.৮৩	৬৪.৪৬

ভেড়া পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ ভেড়া পালনের গুরুত্ব ও ভেড়ার জাত পরিচিতি

ভেড়া পালনের গুরুত্ব ঃ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভেড়া পালন জনপ্রিয়। মাংস, উল ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেড়া পালন হয়ে থাকে। বড় বড় বাণিজ্যিক খামারের মাধ্যমে ভেড়া পালন সম্ভব। তাছাড়া পারিবারিক পর্যায়েও ভেড়া পালন সম্ভব। ভেড়ার মাংস অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু।

ভেড়া পালনের বিশেষ দিক ঃ ভেড়া শান্ত ও ছোট প্রাণী। খাদ্য ও আবাসন জনিত বিনিয়োগ এবং ঝুটকি কম। ভেড়া মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে। ভেড়া গরু ছাগলের সংগে মিশ্রভাবে পালন করা যায়। একটি ভেড়া সাধারণত বছরে দুবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ২ টি করে বাচ্চা দেয়। ভেড়ার মাংসে আয়রন, কপার ও জিংক রয়েছে। জিংক শরীরের ক্ষত নিরাময় এবং টেস্টোস্টেরন এর মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে আয়রন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কপার শরীরে আয়রন বিপাকে এবং লোহিত রক্তকণিকা বিশ্লেষণে সাহায্য করে। ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে। ভেড়ার মাংস প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ভেড়ার মাংসে উৎকৃষ্ট পরিমানে ভিটামিন বি-১২ এবং নিয়াসিন রয়েছে।

ভেড়ার জাত পরিচিতি ঃ দুধ, মাংস ও উল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়াকে তিনটি জাতে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১। মাংস ও অধিক বাচ্চা উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত; ২। উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত; ৩। দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতসমূহ সাধারণত শীত প্রধান দেশে দেখা যায়। সাফ্ক, ডরসেট, হ্যাম্পসায়ার ইত্যাদি অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। প্রাপ্ত বয়স্ক এ সকল ভেড়ার ৯০-১৩৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। মেরিনো, চিভয়েট, ব্ল-ড্ মেইন, লিংকন জাতের ভেড়া অধিক উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা প্রতি বছরে ২-৬ কেজি পর্যন্ত উল উৎপাদন করতে পারে। আওয়াসী, ইস্ট ফ্রিজিয়ান ভেড়া দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা বছরের ২১০ দিনে ৩৫০-৭৫০ লিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদনে সক্ষম।

সাফ্ক জাতের ভেড়া

ডরসেট জাতের ভেড়া

হ্যাম্পসায়ার জাতের ভেড়া

চিভয়েট জাতের ভেড়া

মেরিনো জাতের ভেড়া

লিংকন জাতের ভেড়া

গাড়ল

বাংলাদেশের ভেড়া সমূহ জাত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও এদের বিশেষ স্বকীয়তা রয়েছে। অঞ্চল ভেদে বাংলাদেশে মোট তিন ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়।

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়াঃ রাজশাহী, চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও নাটোর এলাকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ সরু ও ছোট, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া শিংযুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ২২-৩০ কেজি এবং ভেড়ি ১৫-২৫ কেজি ওজন হয়। সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ১-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়।

যমুনা অববাহিকার ভেড়াঃ টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধাসহ যমুনা অববাহিকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ তুলনামুলকভাবে একটু লম্বাটে, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া পেচানো শিংযুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ি ১৫-২২ কেজি হয়। সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ২-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়।

উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়াঃ বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের চরাঞ্চলে যেমন নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়া, লক্ষীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এরা লবণাক্ত স্যাঁত-স্যাঁতে চারণভূমিতে চরতে অভ্যস্ত। এদের শিং পিছনে বাঁকানো কিন্তু পেচানো নয়।

তাছাড়া চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সুন্দরবন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গাড়ল নামে একধরনের দেশীয় ভেড়া পাওয়া যায়। এদের লেজ তুলনামূলকভাবে লম্বা এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।

শারীরিক গঠনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ২ ধরনের ভেড়া দেখা যায়। যথাঃ একটি জাতের কান খুব ছোট ও লেজ খাট। অন্যটির কান মোটামুটি বড় ও লেজ মধ্যম আকৃতির।

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান ঃ ভেড়া লালন পালনের জন্য আলো-বাতাসযুক্ত শুষ্ক স্থানে আবাসন তৈরী করতে হবে। বাসস্থান নির্মানে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে তা হলোঃ

- ঘরটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন ঘর শুষ্ক থাকে এবং প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ঘরে যাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে।
- ঘরে শীত হতে ভেড়াকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া বন্য প্রাণির আক্রমন থেকে সুরক্ষিত থাকে।
- ঘরটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা থাকে।
- ভেড়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঘর তৈরী করতে হবে। সাধারনত প্রতিটি ভেড়ার জন্য সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ১০ বর্গ ফুট এবং ছাড়া অবস্থায় পালনের ক্ষেত্রে ৬-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ভেড়ার বয়স, আকার ও উদ্দেশ্য এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিবর্তন করতে হয়। যেমন, সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ভেড়া লালন করতে হলে তাকে এক্সারসাইজের জন্য অতিরিক্ত জায়গা প্রদান করতে হবে।
- ৫টি ভেড়া পালনের জন্য একটি আদর্শ ঘরের মাপ হলো: ৫ ফিট ঢ ৭ ফিট
- ঘরটির মেঝে মাটি থেকে কমপক্ষে ১.৫ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে।
- ঘরের মেঝে (৬ ফুট × ৫ ফুট) ৩০ বর্গফুট, চালা (৬.২৫ফুট × ৫.৫০ ফুট) ৩৫ বর্গফুট হবে।
- ঘরের সামনের দেয়াল (৬ ফুট লম্বা × ৫ ফুট উচ্চতা), পিছনের দেয়াল (৬ ফুট লম্বা × ৪ ফুট উচ্চতা), বাকি ২ দিকের দেয়াল (৫ ফুট লম্বা × ৪.৫ ফুট উচ্চতা) মাপের হবে। দেয়ালের নিচের অংশ শক্ত ভাবে আবৃত করতে হবে যাতে বন্য প্রাণির আক্রমন থেকে ভেড়াকে রক্ষা করা যায় এবং উপরের অবশিষ্ট অনাবৃত অংশ তারজালি দিয়ে আবৃত করতে হবে যাতে করে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে।
- এধরনের একটি ঘর তৈরীতে প্রায় ৭-৮ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো বাঁশ, টিন, কাঠ তারজালি।

উল্লেখ্য যে ভেড়ার ঘরে যাতায়াত করার জন্য দরজার সাথে একটি বাশেঁর সিড়ি সংযোজন করতে হবে। তবে মুক্তভাবে (সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায়) পালনের ক্ষেত্রে ভেড়া প্রতি জায়গা আরো কম হলেও চলে। কেননা এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাতে ভেড়া ঘরে অবস্থান করে। আমাদের দেশে এ ধরনের খামারের সংখ্যা বেশী। এসকল ভেড়া সারাদিন উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করে, সবুজ ঘাস, পাতা, খড় খায় এবং রাতে খামারির বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে। যাদের চাষযোগ্য জমির অভাব রয়েছে তারা সাধারণত এ ধরনের পারিবারিক ভেড়ার খামার স্থাপন করে থাকে।

অধিবেশন-৩ ভেড়ার খাদ্যাভাস, খাদ্য উপাদন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খাদ্যাভাস: ভেড়া গরু-ছাগলের মতই মাঠে চরে লতাপাতা, ঘাস, গুল্ম, হে, খড়, সাইলেজ, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। এরা সহজেই নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয় এমনকি প্রতিকূল পরিবেশে শুধুমাত্র খড় ও নাড়া খেয়েও ভালোভাবে বেঁচে থাকে।

খাদ্য উপাদানঃ ভেড়ার মূল খাদ্য উপাদান হলো সবুজ ঘাস। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় চারণ ভূমির পরিমান কম থাকায় ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঘাস চাষের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল জাতের ঘাস যেমন- নেপিয়ার, পারা, গিনি, জাম্বু জাতীয় ঘাস চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া ইপিল-ইপিল, ধইঞ্চা, অড়হর জাতীয় গুল্মও ভেড়া খেয়ে থাকে। তাছাড়া এরা সবুজ ঘাস এর পাশাপাশি দানাদার খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে।

দানাদার খাদ্যঃ ভেড়াকে সাধারণত সবুজ ঘাসের পাশাপাশি খাদ্য হিসেবে গমের ভুষি, চালের কুড়া, মাসকলাই, খেসারী, মটর ইত্যাদির ভুষি এবং বিভিন্ন ধরনের খৈল, ফিসমিল বা মাছের গুড়া, খনিজ লবন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির মিশ্রণ দানাদার খাদ্য হিসাবে সবরবরাহ করা হয়ে থাকে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা টেবিলে দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	বাচ্চা ভেড়া(৩-৬ মাস)	বাড়ন্ত ভেড়া(৭-১৫মাস)	বয়স্ক ভেড়া (১৫ মাস+)
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩০	১৫	১০
ডালের গুড়া	৫	-	-
গমের ভুষি/চালের কুড়া	২৯	৪৫	৫০
মাসকলাই/খেসারী ডালের ভুষি	৫	১৫	১৫
খৈল (তিল/সয়াবিন/সরিষা)	২৫	২০	২০
শুটকি মাছের গুড়া/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫	১	১
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া	২	২	২
খনিজ লবন	১	১.৫	১.৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০

মিল্ক রিপ্লেসার/বিকল্প দুধের উপাদানঃ মা ভেড়া হতে একাধিক বাচ্চা জন্মালে বা মা ভেড়া হতে দুধ উৎপাদন কম হলে বাচ্চা ভেড়াকে বিকল্প দুধ সরবরাহ করতে হয়। তাছাড়া বিকল্প দুধ বাচ্চা ভেড়াকে সম্পূরক খাদ্য হিসাবেও সরবরাহ করা যেতে পারে। বিকল্প দুধের উপাদান সমূহ টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

উপাদান	পরিমান %
গুড়া দুধ	৭০
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	২০
সয়াবিন তৈল	৭
খনিজ লবন	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া	১.৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
সর্বমোট	১০০

উক্ত মিশ্রণের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশাতে হবে। পানিকে অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে পুণরায় কুসুম গরম অবস্থায় ঠান্ডা করে বিকল্প দুধ তৈরী করতে হবে। বাচ্চা জন্মের পর থেকে প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম করে দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

বাচ্চা ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ বয়স ভেদে বাচ্চার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান টেবিলে উপস্থাপন করা হলে।

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
		মায়ের দুধ /বিকল্প দুধ	দানাদার খাদ্য	কঁচি ঘাস/লতা-পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
০	১.৫	২৯০	-	-	-
১	২.০	৩৬০	-	-	-
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমান	-
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্য পরিমান	-
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমান	-
৫	৩.৬	৫৬০	২০	১০০	-
৬	৪.০	৬০.০০	২৫	১৫০	সামান্য পরিমান
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১৫০	সামান্য পরিমান
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১৫০	২০
৯	৫.০	৫৫০	৪০	১৭৫	৩০
১০	৫.৪	৫০০	৫০	২০০	৩০
১১	৫.৭	৪৫০	৭৫	২৫০	৩০
১২	৬.১	২০০	৯০	৩০০	৪০
১৩	৬.৫	১০০	১৫০	৩৫০	৫০
১৪	৬.৯	১০০	২০০	৪০০	৭০
১৫	৭.৩	-	২০০	৪৫০	৭০
১৬	৭.৭	-	২০০	৫০০	১০০

বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ বাড়ন্ত ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্যের তালিকা টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

বয়স (মাস)		ওজন (কেজি) পানি (মি.লি.)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
			দানাদার খাদ্য	কঁচি ঘাস/লতা-পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস	
৪		৮.০	৫০০	২৫০	৪০০	১০০
৫		৯.৩	৫০০	৩০০	৫০০	১০০
৬		১১.৫	৫০০	৩০০	৫৫০	১০০
৭		১৩.২	৫০০	৩০০	৬২০	১০০
৮	ভেড়ী	১৫	৬০০	৩০০	৭৫০	১০০
৯		১৬.৮	৬০০	৩০০	৮০০	১০০
১০		১৮.৬	৬০০	৩৫০	৮০০	১০০
১১		২০.৪	৭০০	৪০০	৮০০	১০০
১২		২২.২	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০
১৩		২২.২	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০
১৪		২৩.০	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০
১৫		২৪.০	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০

প্রজনন যোগ্য ভেড়া পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ প্রজনন কার্যক্রমে ব্যবহার হবে এমন পাঁঠাকে পর্যাপ্ত পরিমানে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দৈনিক ৩৫০-৫০০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে। গাঁজানো ছোলা খাওয়ানো হলে পাঁঠার প্রজনন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে। এক্ষেত্রে পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা খাওয়ানো যাবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার দেয়া যাবে না। তাছাড়া বছরে ২বার ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে কৃমিনাশক ও ভিটামিন প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভিটামিন এ,ডি,ই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধিবেশন-৪ ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খামার লাভজনক ও টেকসই করতে হলে সঠিক পাঁঠা নির্বাচন, ভেড়ী নির্বাচন, প্রজনন বয়স নির্ধারণ, পালে ভেড়ী ও পাঁঠার অনুপাত নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক পাঁঠা ভেড়া নির্বাচন ঃ সঠিক পাঁঠা নির্বাচন একটি ভেড়ার খামারের মৌলিক বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়া পাঁঠা নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রতি প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়। একটি পাঁঠা ভেড়া নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাস হতে হবে।
- নির্বাচিত পাঠ অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থ্যাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে।
- পাঁঠা প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে।
- ভেড়ার অন্ডকোষ সুগঠিত হতে হবে। পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- পাঁঠা তুলনামুলকভাবে আকারে বড় ও সোর্য বীর্যশালী হওয়া উচিত।

সঠিক ভেড়ী নির্বাচন ঃ বাণিজ্যিক খামারে সঠিক ভেড়ী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়ী নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়। একটি ভেড়ী নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় ভেড়ী বয়স ৯-১৩ মাস হতে হবে।
- ভেড়ী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থ্যাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে। তাছাড়া মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান ও প্রতিবারে ২ টি বাচ্চা প্রদানের ইতিহাস থাকতে হবে।
- ভেড়া প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে।
- ওলান সুগঠিত, অধিক দুধ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- শরীর অনেকটা ত্রিকোনাকৃতি ও পা সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ভেড়া গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেওয়ার আদর্শ সময়ঃ

- ভেড়া গরম হলে সোজাভাবে দাড়িয়ে থেকে লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে।
- ভেড়ার যোনীদ্বার লাল ও ফোলা হবে এবং যোনীদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে।
- ভেড়ার খাওয়া দাওয়া কমে যায়, পাঁঠার গা ঘেষে অবস্থান করে, ডাকাডাকি করে।
- ভেড়া গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করানো জরুরী।
- পাঁঠার ত্রুটিপূর্ণ শুক্রানু ও ভেড়ীর ত্রুটিপূর্ণ ডিম্বানুর কারণে ডিম নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে।
- অপুষ্টিজনিত কারণেও ডিম নিষিক্ত না হলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে। তাছাড়া হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে বা অতিরিক্ত গরম ও অসহনীয় অবস্থার কারণেও ফার্টিলাইজেশন ব্যাহত হলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে। সুতরাং সঠিক সময়ে পাল দেওয়া ও প্রজনন রোগের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে পাঁঠা ও ভেড়ী খামার থেকে বাতিল করতে হবে।
- বারে বারে প্রজননে একই পাঁঠা বা একই পাঁঠার বীজ ব্যবহারে বিরত থাকতে হবে। ফলে ইন-ব্রিডিং সমস্যা দূর হবে।
- প্রজনন ব্যবস্থাপনায় ভাল পাঁঠা ও ভাল ভেড়ী নির্বাচন করে সিলেকটিভ ব্রিডিং করা গেলে জাত উন্নয়ন হবে।

অধিবেশন-৫ ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে ভেড়া পালন পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু উন্নত পশম উৎপাদন ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের ভেড়া পালন উপযোগী না। একারনে এদেশের আবহাওয়াতে সহনশীল দেশীয় ভেড়ার খামার গড়ে উঠেছে। ভেড়া সহজেই বিভিন্ন আবহাওয়ায় সহনশীল হওয়ায় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অধিক হওয়ায় সম্ভবনাময় ভেড়া পালন এদেশের কিছু অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভেড়া পালন পদ্ধতি বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে বা সামগ্রিক ভাবে ভিন্নতর। এসকল পালন/উৎপাদন পদ্ধতি কয়েক ভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- **আধা নিবিড় সাবসিস্টেন্স খামার:** এ পদ্ধতি সারাদেশেই দেখা যায়। খামারিগণ এককভাবে বা গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবে ২-৬ টি ভেড়া পালন করে। ভেড়া রাতের বেলা গরু-ছাগলের ঘরে অবস্থান করে এবং দিনের বেলা মাঠে, বাগানে রাস্তার ধারে চরে বা বেড়িবাঁধ পালন করা হয়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভুসি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসকল খামারে ইনব্রিডিং সমস্যা বেশী।

- **সম্পূর্ণ ছেড়ে পালা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামার:** এক্ষেত্রে ১৫-৪০ টি ভেড়া বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হয়। খামারিগণ দিনের বেলা ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে চরায়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভুসি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বছরে ১-২ বার পশম সংগ্রহ করা হয়।

- **বরেন্দ্র এলাকার আধা নিবিড় বাণিজ্যিক খামার:** এধরণের খামার সাধারণত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল খামারিগন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল খামারে সময়ভেদে ৫০-১৫০ ভেড়া প্রতিপালন করা হয়। এক্ষেত্রে ১-২ জন রাখাল ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভেড়াকে চরানো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। আমন ও রবিশস্য কাটার পর ভেড়া মাঠে চড়ে বেড়ায় এবং ঝরা ধান, ছোলা, খেসারী ও নতুন গজানো ঘাস খায়। তাছাড়া বাগানে, ঝোপে, রাস্তার ধারেও ভেড়া চড়ানো হয়। এ পদ্ধতিতে পালিত ভেড়াকে খড় ও দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বছরে ৩-৪ বার পশম সংগ্রহ করা হয় যা সাধারণত নিম্নমাণের কম্বল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- **চরে সম্পূর্ণ ছেড়ে ভেড়া পালন:** এ ধরনের ভেড়া উপাদন পদ্ধতিতে লবণাক্ত স্যাঁত-স্যাঁতে চরে ভেড়া সম্পূর্ণ ছেড়ে পালন করা হয়। ভেড়া পালনের জন্য ভেড়ার সংখ্যা ভেদে ২-৫ জন রাখাল থাকে। ভেড়া সারাদিন কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাঠে চড়ে বেড়ায়, ঘাস খায়, ম্যানগ্রুব অঞ্চলের লতা-পাতা খায়। জোয়ার এবং রাতের বেলায় কেল্লায় অবস্থান করে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (ঈদ/পূজা) ভেড়া বিক্রি হয়ে থাকে। এ পালন পদ্ধতিতে কোন প্রকার দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। যদিও এদের উৎপাদনশীলতা কম কিন্তু এই ধরণের পালন পদ্ধতি লাভজনক।

- **সমন্বিত খামার:** এ পদ্ধতিতে গরু-ছাগল এর সাথে মিশ্রভাবে ভেড়া পালন করা হয়।

- **নিবিড় ভেড়া পালন ব্যবস্থা:** এ পদ্ধতিতে ভেড়া সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়। ভেড়াকে প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য, ঘাস ও পানি সরবরাহ করা হয়। এ পদ্ধতি লাভজনক ও সম্ভবনাময়। বর্তমানে দেশে এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা গেলে ভেড়া পালনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।

গর্ভবতী ভেড়ার যত্নঃ গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায়ে ভেড়ীকে ২য় কোন ভেড়ার কাছে নেয়া যাবে না। গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে নরম বিছানা দিতে হবে।গর্ভবতী ভেড়ীকে আলাদা রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে গমের ভুষি, কাচা ঘাস, তিলের খৈল, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করতে হবে।

প্রসব পূর্ববর্তী, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনাঃ

- গর্ভকালের শেষ সপ্তাহে ভেড়ীর বিশেষ যত্নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- এসময় আবদ্ধ অবস্থায় পালনকৃত ভেড়ীকে মেটারনিটি প্যান বা প্রসব ঘরে রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।
- ছাড়া অবস্থায় চরে থাকা ভেড়ীকে গর্ভাবস্থার শেষ ২ সপ্তাহ বিশেষ নজরে রাখতে হবে।
- এসময়টিতে কোনভাবেই ভেড়ীকে পাঁঠার কাছাকাছি রাখা যাবে না।
- বাচ্চা প্রসবের লক্ষণ দেখা গেলে কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জীবানুমুক্ত কাঁচি, আয়োডিন, সুতা প্রস্তুত রাখতে হবে।
- বাচ্চা জন্মদানকালে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে বা বাচ্চা আটকিয়ে গেলে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভেটেরিনারিয়ানের সাহায্য নিতে হবে।
- বাচ্চা জন্মানোর পর ভেড়ীকে পর্যাপ্ত পরিমানে স্যালাইন মেশানো পানি সরবরাহ করতে হবে।
- প্রসব পরবর্তী ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ নিতে হবে।

বাচ্চা ভেড়ার যত্নঃ

- বাচ্চা জন্মানোর পর অতিদ্রুত বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার সুতি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- বাচ্চার জন্মের পর মা ভেড়ী যাতে বাচ্চার শরীর চেটে পরিষ্কার করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। কেননা, এতে বাচ্চার শ্বাস-প্রশ্বাস শুরুর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।
- বাচ্চা জন্মানোর পর যতদ্রুত সম্ভব প্রতিটি বাচ্চা যাতে শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

অধিবেশন-৬ ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনায় জীব নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ

ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনাঃ ভেড়া প্রাকৃতিকভাবে সহজেই প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে অধিক। এতদসত্ত্বেও ভেড়া প্রতিপালনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো রোগ-ব্যাধি। রোগ ব্যবস্থাপনা জানতে হলে আগে সুস্থ ভেড়া চেনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সুস্থ ভেড়া চেনার উপায়ঃ

- ❖ চোখ, মুখ, নাক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হবে।
- ❖ লোম ও চামড়া মসৃণ ও পরিষ্কার থাকবে।
- ❖ মুখের উপরে মাজেলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাবে।
- ❖ ঠিকমত জাবর কাটবে, চলাফেরা স্বাভাবিক হবে এবং খাদ্যের প্রতি আগ্রহ থাকবে।
- ❖ দলভূক্ত হয়ে মাঠে চড়বে এবং চলাচল করবে।
- ❖ শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হবে।
- ❖ অচেনা লোক কাছে আসলে সচেতন হবে।

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের ব্যত্যয় ঘটলেই একটি ভেড়াকে অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক ভেড়াকে সুস্থ করে তোলার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক জীব নিরাপত্তা (বায়োসিকিউরিটি) নিশ্চিতকরণ, রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান এবং রোগ হলে সঠিক চিকিৎসা প্রদান অন্যতম অনুসঙ্গ।

জীব-নিরাপত্তা ঃ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কাঙ্খিত জীবে অনাকাঙ্খিত জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়, জীব-নিরাপত্তা বলতে সেই সকল কার্যক্রম গ্রহণকে বুঝায়। ভেড়ার খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলোঃ

- ❖ ভেড়ার সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে। বাসস্থান শুকনো এবং আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে তৈরী করতে হবে।
- ❖ ভেড়ার খামার বন্য প্রাণি বা অন্যান্য আক্রমণকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- ❖ খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে।
- ❖ খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❖ খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।
- ❖ ভেড়াকে সঠিক সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।
- ❖ রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত ভেড়াকে কোয়ারেনটাইন কক্ষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ কোন ভেড়ার মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ নতুন ভেড়া খামারে সংযোজন করার ক্ষেত্রে ইহাকে কোয়ারেনটাইন করে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করে অন্য ভেড়ার সাথে মিশতে দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় টিকা প্রদান ঃ খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে। ভেড়ার সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের (যে সকল রোগের মৃত্যু ঝুঁকি বেশী) টিকা পাওয়া যায়। এসকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে ভেড়ার মৃত্যুঝুঁকি রয়েছে এমন রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব। ভেড়ার টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলোঃ

রোগ	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৯ মাস	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ	১ম ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)			১ম ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)	
পিপিআর		১ম ডোজ			
পক্স			১ম ডোজ		

- ❖ একথাইমা রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩য় দিনে এবং ১০-১৪ তম দিনে পুনরায় টিকা প্রদান করা যেতে পারে।
- ❖ এন্টারোটক্সিমিয়া রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬ মাস বয়সে টিকা প্রদান করা যেতে পারে।
- ❖ ক্ষুরা রোগের টিকা প্রতি ৬ মাস পর পর প্রদান করতে হবে।
- ❖ যেহেতু খামারের সকল ভেড়ার বয়স এক নয়, সে কারণে টিকা প্রদানের কর্মসূচি এক মাস পর্যন্ত আগ-পিছ করা যাবে।

অধিবেশন-৭ ভেড়ার বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার

ভেড়া তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামারের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

এন্থ্রাক্স ঃ এন্থ্রাক্স হলো ব্যাসিলাস এন্থ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন জনিত রোগ।

রোগের লক্ষন ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মরে যেতে পারে। গায়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫-১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। মৃত্যুর পর নাক, মুখ, পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কালো জমাটবিহীন রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

এন্টারোটক্সিমিয়া ঃ ভেড়াকে অধিক পরিমানে দানাদার খাদ্য প্রদান করলে ভেড়া লক্ষন প্রকাশের আগেই মারা যায়।

রোগের লক্ষন ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মারা যেতে পারে। ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যাথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে পা ছড়াছড়ি করে, গায়ের তাপমাত্রা কমে যায়। আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। পাতলা পায়খানা হয়। দুর্বল হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা। বিশেষত স্বাস্থ্যবান ভেড়াকে পরিমিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা।

ল্যাম্ব ডিসেন্ট্রি ঃ সাধারণত ১-৪ দিন বয়সি বাচ্চাতে বেশী দেখা যায় তবে ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগ হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ২০-৩০%।

রোগের লক্ষন ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই বাচ্চা ভেড়া মারা যেতে পারে। দুধ খাওয়া অবস্থায় ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যাথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। আমাশয় হতেও পারে নাও হতে পারে। দুর্বল হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ মা ভেড়ার ওলান পরিষ্কার রাখতে হবে। বাচ্চা ভেড়ার বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

টিটেনাস ঃ ভেড়ার বাচ্চাকে খাসী করনের সময় টিটেনাস টক্সয়ড টিকা প্রদান না করলে সে ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রবেশ ঘটে এবং রোগাক্রান্ত হয়। এরোগে মৃত্যুঝুঁকি প্রায় শতভাগ।

রোগের লক্ষন ঃ সাধারণত আক্রান্ত ভেড়ার বিভিন্ন অংশের মাংশপেশী শক্ত হয়ে যায়। মাংসপেশীর খিচুনি, প্রস্রাব পায়খানা না হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ধীরে ধীরে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যায়।

চিকিৎসা ঃ এ রোগের চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ ক্যাসট্রেশন বা যেকোন অস্ত্রপাচার করার পূর্বেই টিটেনাস টক্সয়েড প্রদান করতে হবে।

ফুট রট ঃ সাধারণত পায়ের ক্ষুরার গোড়ায় পচন দেখা দেয়, দুর্গন্ধ হয়। কখনো কখনো ওলানেও রোগ সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে ভেড়ার পা ৫% কপার সালফেট দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করে এন্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভাইরাস জনিত রোগ ঃ

ভেড়ার বসন্ত (শীপ পক্স) ঃ এ রোগে বাচ্চা ভেড়াতে মৃত্যু হার অনেক বেশী। এ রোগ সহজেই এক ভেড়া হতে অন্য ভেড়াতে ছড়ায়।

লক্ষন ঃ বাচ্চা ভেড়াতে জ্বর, ঝিমুনি, নাক ও মুখ দিয়ে পানি পড়া। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে। বয়স্ক ভেড়ার পালুপথ, দুধের বাটে, মুখ গহবরে, কানে গুটি উঠতে দেখা যায়।

পিপিআর ঃ এরোগে আক্রান্ত ভেড়াতে পাতলা পায়খানা, নাক দিয়ে তরল বের হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৬-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উন্নীত হওয়া এবং শ্বাস কষ্ট দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা প্রদান না করলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।

ক্ষুর রোগ ঃ আক্রান্ত ভেড়াকে প্রথমদিকে খুড়িয়ে হাটতে দেখা যায়। পরবর্তীতে মুখে, ডেন্টাল প্যাডে, ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়তে দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

পরজীবিজনিত রোগঃ পরজীবিজনিত রোগ সমূহের মধ্যে কলিজা কৃমি, হেমনকোশিস, মেনজ (টিকস সংক্রমণ), উকুন, আঠালি ও প্রটোজোয়া সংক্রমনজনিত রোগ উল্লেখযোগ্য। এসকল রোগ নিয়ন্ত্রনে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা হলোঃ

- বছরে অন্তত ২ বার কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।
- ভেড়াকে ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণে ডিপিং করতে হবে অথবা ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুসারে সঠিক মাত্রায় চামড়ার নীচে আইভারমেকটিন ইনজেকশন করাতে হবে।
- প্রটোজোয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

অধিবেশন-৮ ভেড়া হতে উল উৎপাদন এবং ৩০টি ভেড়া সমৃদ্ধ খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ভেড়া হতে উল উৎপাদনঃ বাংলাদেশে সাধারণত মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে। তবে ভেড়া থেকে কিছু পরিমান উল উৎপাদিত হয়ে থাকে। এসকল উল সাধারণত গুণগত দিক থেকে নিম্নমানের। উৎপাদিত উল সাধারণত কার্পেট, কম্বল ও মাদুর তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বছরে ২-৩ বার শেয়ারিং এর মাধ্যমে উল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত হস্তচালিত ব্লেড দিয়ে শেয়ারিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয় তবে ইলেক্ট্রিক্যাল শেয়ারার ব্যবহার অধিক নিরাপদ। উল সংগ্রহ করার পূর্বে কিছু প্রস্তুতিমূলক বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা:

- উল সংগ্রহের পূর্বে ভেড়াকে ভালভাবে গোসল করিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- উল/পশম যাতে ভিজা না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- শেয়ারিং করা স্থানের মেঝে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনো ও পাঁকা হতে হবে।
- শেয়ারিং এর সময় ভেড়ার চার পা সঠিকভাবে বেধে নিতে হবে অথবা ভেড়া দাড়ানো অবস্থার যথেষ্ট আয়ত্বের মধ্যে রেখে শেয়ারিং সম্পন্ন করতে হবে।

সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে ৩০ টি ভেড়া বিশিষ্ট খামার এর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

খরচের খাত	টাকার পরিমান
প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগঃ	
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ছন ও বাঁশের তৈরী ঘর	২০০০০.০০
৩০ টি গর্ভবতী ভেড়া ও ৩ টি ভেড়ার মূল্য @৫০০০/-	১৬৫০০০.০০
খাবার পাত্র, পানির পাত্র ও অন্যান্য	৪০০০.০০
বিনিয়োগকৃত মূলধন	১৮৯০০০.০০
১ম বছরের আবর্তক ব্যয়	
প্রতিটি ভেড়ার প্রতিদিনের দানাদার খাবার ০.২৫ কেজি হারে ৩৬৫ দিনে মোট দানাদার খাদ্য লাগবে ০.২৫x৩৬৫=৯১.২৫ কেজি। সুতরাং প্রতিকেজি ৪০ টাকা হারে ৩৩ টি ভেড়ার দানাদার খাদ্য বাবদ খরচ হবে ৯১.২৫ x৩৩ x ৪০=১২০৪৫০.০০	১২০৪৫০.০০
প্রতিটি ভেড়ার দৈনিক ২ কেজি কাঁচা ঘাস হিসেবে ৩৩ টি ভেড়ার ৩৬৫ দিনে খরচ বাবদ @ ২ টাকা/কেজি	৪৮১৮০.০০
৬০ বাড়ন্ত ভেড়ার ১৮০ দিনের দানাদার খাদ্য খরচ @০.১৫ কেজি/ভেড়া	৬৪৮০০.০০
৬০ বাড়ন্ত ভেড়ার ১৮০ দিনের কাঁচা ঘাস বাবদ খরচ ১ কেজি/ভেড়া	২১৬০০.০০
আনুষাঙ্গিক ও ঔষধ বাবদ খরচ	৫০০০.০০
১ম বছরের মোট আবর্তক ব্যয়	২৬০০৩০.০০
১ম বছরের মোট আয়	
৬০ ভেড়া বিক্রয় বাবদ @৫০০০/-	৩০০০০০.০০
বিষ্টা বিক্রয়	১০০০০.০০
মোট আয়	৩১০০০০.০০
নীট খরচ (আবর্তক ব্যয়+মূলধন ব্যয়ের এক দশমাংশ) (একবার মূলধন ব্যয় দিয়ে ১০ টি ব্যাচ প্রতিপালন করা যাবে) (২৬০০৩০.০০+১৮৯০০.০০=২৭৮৯৩০০.০০/-)	২৭৮৯৩০.০০
১ম বছরের নীট মুনাফা (মোট আয়-নীট খরচ)	৩১০৭০.০০
পরবর্তী বছর হতে ১ম বছরের নীট মুনাফার কয়েকগুন হিসাবে নীট মুনাফা অর্জিত হবে।	

পাঁঠা পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ ছাগলের জাত পরিচিতি ও ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের গুরুত্ব

ছাগলের জাত পরিচিতি ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক জাতের ছাগল রয়েছে।

১. মাংস উৎপাদনকারী জাত (ব্ল্যাক বেঙ্গল, বোয়ার, দামানি, বিটল প্রভৃতি)। এ জাতের মাংস অত্যন্ত ভাল মানের।

২. দুধ উৎপাদনকারী জাত (যমুনাপারী, সানেন, অ্যাংলোনুবিয়ান, বারবারি, ব্রিটিশ আলপাইন প্রভৃতি)। ছাগী হতে প্রতিদিন গড়ে ১-৪ লিটার দুধ পাওয়া যায়।

৩. চামড়া উৎপাদনকারী জাত (ব্ল্যাক বেঙ্গল, মালাবার, বারবারি, দামাসকাস প্রভৃতি)। এই শ্রেণির ছাগলের চামড়া দিয়ে উন্নতমানের চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

৪. পশম উৎপাদনকারী জাত (অ্যাংগোরা, কাশ্মিরী, মেরাডি প্রভৃতি)। এ শ্রেণির ছাগলের লোম হতে উন্নতমানের দামী পোশাক ও গরম কাপড় তৈরি করা হয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল

চিত্রঃ বোয়ার জাতের ছাগল

আংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র ঃ বারবারি জাতের ছাগল

চিত্রঃ দামানি জাতের ছাগল

চিত্রঃ বিটল জাতের ছাগল

যমুনাপারী জাতের ছাগল

কাশ্মিরী জাতের ছাগল

চিত্রঃ সানেন জাতের ছাগল

টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

চিত্র ঃ মালবারি জাতের ছাগল

আংগোরা জাতের ছাগল

বাংলাদেশের ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দু'টি জাত দেখা যায়। এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনাপারী ছাগল।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ খাটো। উচ্চতা ১৬-২০ ইঞ্চি। দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরী বা সাদা বা মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়। কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল। শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি। ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর ওলান ছোট ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি মাংস পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে।

যমুনাপারী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ যমুনাপারী ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে। এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে। এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত। বাট মোটা ও লম্বা। শরীরের উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি। পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে। এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে। ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দধু দেয়। এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়। তবুও দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা পালনের গুরুত্ব ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ছাগলের সংখ্যা ২৬৬.০৪ লক্ষ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ২০২০-২১)। ছাগলের সংখ্যার অধিকাংশ ব্ল্যাকবেঙ্গল জাতের। এ জাতের উচ্চ জেনেটিক বৈশিষ্ট রয়েছে। সঠিক প্রজননের মাধ্যমে এ জাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার সম্ভব। কিন্তু ৭০% খামারী প্রজনন পাঁঠার তীব্র সংকটের শিকার হয় কারণ তাদেরকে প্রাকৃতিক প্রজননের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া পাঁঠা সংকটের কারণে আন্তঃপ্রজনন (ইনব্রিডিং) বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পাঁঠা পালনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছাগলের ঘর নির্মাণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মাণ করা উত্তম। ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা-লম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল।

ছাগল খামারে যে সকল ঘর থাকা প্রয়োজন ঃ পারিবারিক পদ্ধতিতে এবং মুক্তভাবে ছাগল পালন করলে ছাগলের জন্য আলাদা ঘরের তেমন প্রয়োজন হয় না। মানুষের থাকার ঘরের একপাশে, ঘরের পাশের বারান্দায় অথবা গোয়াল ঘরের গরুর সাথে ছাগল পালন করা হয়। আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে একসাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ঘর তৈরি করতে হয়।

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণি-বিন্যাস ঃ

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরকে দু'ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. মেঝে পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে ছাগলকে মেঝেতে পালন করা হয়।

খ. মাচা পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে মেঝের উপর মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল পালন করা হয়।

নির্মাণ উপকরণের উপর ভিত্তি করে মেঝে পদ্ধতির ঘর তিন রকম হতে পারে–

১. কাঁচা মেঝের ঘর

২. অর্ধ-পাকা মেঝের ঘর এবং

৩. পাকা মেঝের ঘর।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের ঘরের স্থান নির্বাচন ঃ লাভজনকভাবে খামার করতে হলে ছাগলের জন্য পরিস্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের পরিবেশ রয়েছে এমন আবাসন প্রয়োজন। অপরিস্কার স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের বিভিন্ন রোগ বালাই হতে পারে। ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার, দুধ প্রদানের পরিমান এবং বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যায়।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘর নির্মাণ ঃ

আয়তনঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে সাধারণতঃ ১৪-১৬ ঘন্টা সময় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়। এজন্য এ পদ্ধতিতে একটি ছাগলের জন্য ৮-৯ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১৬ x ১২ বর্গফুট ঘরে ২৪ টি বয়স্ক ছাগল রাখা যায়। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

ঘরের ধরণ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগলকে রাখতে হবে। মাচার উচ্চতা ৫ ফুট হবে এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা হবে ৬-৮ ফুট। গোবর ও পেশাব পড়ার সুবিধার্থে মাচার মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

বাস ঘরের বিন্যাস ঃ বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখা উচিৎ। পাঁঠাকে সবসময় ছাগী হতে পৃথক রাখা উচিৎ। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। ছাগল ছানাকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত মা ছাগীর সাথে রাখা উচিৎ। বাড়ন্ত ছাগল ও খাসীকে একসাথে রাখা যেতে পারে তবে তাদেরকে পৃথকভাবে খাওয়াতে হবে।

ব্রুডিং পেন ঃ বাঁশের খাঁচা বা কাঠের খাঁচাকে ব্রুডিং পেন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর চারপাশ ছালা বা চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকবে। খাঁচার মেঝেতে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকবে। ৬০ x ৫৬ x ৬০ ঘন সে.মি. আয়তনের ব্রুডিং পেনে ২ টি ছাগীসহ ৪-৬ টি বাচ্চা রাখা যায়। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে খাঁচা প্রতি ১ টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায়।

অধিবেশন-৩ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস ঃ ছাগল রোমন্থক প্রাণী। ছাগল সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্যের অভাব হলে ছাগল অত্যন্ত নিম্ন পুষ্টিমানযুক্ত খাদ্য খেতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণি খায় না। ছাগল সাধারণতঃ কাঁঠাল, আম, কলা, তুঁত, গামারী, ইপিল-ইপিল, বট, বরই, ভুট্টা, সূর্যমুখী প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দূর্বাঘাস, লতা, গুল্ম, কাটা-ঝোপ এবং বাড়ির শাক-সবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে ছাগল তার খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে অধিক দুধ ও মাংস এবং উন্নতমানের চামড়া উৎপাদনের জন্য ছাগলকে সম্পূরক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
> ১৮	৩৫০	২.০

দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ওজন (কেজি)	দুধের পরিমান (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস/পাতা (কেজি)	খড় (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫	-	১.০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৫০০	২.০
৪০	১.০০	৪০০	২.৫	৬৫০	২.০

বিভিন্ন ওজনের খাসীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩	৬.০	০.৪০	০.০২	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫	০.০৫	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০	০.০৫	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০	০.১০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০	০.১৫	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০	৩০০	৪০০

বাচ্চা ও বড় ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা ছাগলের খাদ্য	বড় ছাগলের খাদ্য
ছোলা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম ভাঙ্গা	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
গমের ভুসি	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ	০৪ ভাগ	০৪ ভাগ
লবণ	০১ ভাগ	০১ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

টিথারিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো ঃ ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এ খাদ্যের মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুড়া, ভুষি, চাল, ডাল, ছোলা ইত্যাদি) থাকতে হবে। একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

প্রজননের পাঁঠাকে খাওয়ানো ঃ যখন প্রজনন করা হয় না তখন পাঁঠাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাল ঘাস দিলেই চলে। প্রজনন কাজে ব্যবহৃত পাঁঠাকে ওজন ভেদে ঘাসের সাথে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমান দানাদার খাবার দেয়া যেতে পারে। পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখারজন্য প্রতিদিন ১০ গ্রাম পরিমান গজানো ছোলা দেয়া উচিত। তাদেরকে কখনোই অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত হতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য বাদ দিতে হবে।

টেবিল ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

উপাদান	শতকরা হার
গম/চাল/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
গমের ভুষি/আটা/ কুড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকলাই/অন্য ডালের ভুষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা প্রভৃতির খৈল	২০.০০
শুটকি মাছের গুড়া	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবন	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

অধিবেশন-৪ ছাগলের জাত উন্নয়নে বাছাইকরণের ভূমিকা ও কৌশলঃ

ভূমিকা ঃ ছাগলের জাত উন্নয়নে বাছাইকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাছইকরণের উপর নির্ভর করে উৎপাদনশীলতা কেমন হবে। বাছাইকরণের ক্ষেত্রে উত্তম পাঁঠা ও ছাগী নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী। পাঁঠা ও ছাগী নির্বাচনে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে-

ছাগী নির্বাচনের কৌশল ঃ প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ❖ নির্বাচিত ছাগী হবে অধিক উৎপাদনশীল বংশের, আকারে বড়, আকর্ষণীয় গঠন হতে হবে।
- ❖ সম্ভব হলে নির্বাচিত ছাগীর বংশ ইতিহাস বিশেষ করে বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা সমন্ধে জেনে নিলে ভালো হয়। নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী বা নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দিতে হবে এবং প্রতিবারে (অন্তত ৭৪% ক্ষেত্রে) দুই বা ততোধিক বাচ্চা দিতে হবে।
- ❖ নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী বা নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হতে হবে।
- ❖ নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী বা নানীকে দৈনিক কমপক্ষে ৬০০-৭০০ গ্রাম দুধ দিতে হবে।
- ❖ নয় থেকে বার মাস বয়সের ছাগী বা গর্ভবতী ছাগী নির্বাচন করতে হবে।
- ❖ নির্বাচিত ছাগী তুলনামূলকভাবে লম্বাটে, পা খাটো কিন্তু সমান্তরালভাবে সাজানো হবে।
- ❖ নির্বাচিত ছাগীর ওলান সুগঠিত, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা লক্ষ্যযোগ্যভাবে দেখা যাবে।
- ❖ নির্বাচিত ছাগীর পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া, প্রসারিত, দুইটি হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙ্গুল ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে। এতে ছাগলের অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং দুই বা ততোধিক বাচ্চা ধারণ করতে পারে।
- ❖ নির্বাচিত ছাগীর বুক চওড়া হবে যাতে সামনের দুই পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।

পাঁঠা নির্বাচনের কৌশল ঃ পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ❖ নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২ মাসের মধ্যে হবে।
- ❖ অন্ডকোষের আকার বড় ও সুগঠিত হতে হবে।
- ❖ পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- ❖ নির্বাচিত পাঁঠা অধিক উৎপাদনশীল বংশের, আকারে বড় ও শৌর্য্য বীর্যশীল।
- ❖ নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী নানীকে বছরে ২ বার বাচ্চা এবং প্রতিবারে কমপক্ষে (৭৪% ক্ষেত্রে) দুইবা ততোধিক বাচ্চা দেওয়া উচিত।
- ❖ নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হওয়া উচিত।
- ❖ নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী নানীকে দৈনিক কমপক্ষে ৬০০-৭০০ গ্রাম দুধ হওয়া উচিত।
- ❖ নির্বাচিত পাঁঠা সবরকমের যৌন রোগ মুক্ত হওয়া উচিত।

অধিবেশন-৫ প্রজনন পাঁঠা নির্বাচন

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয়। বাছাই ক্রিয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	উৎপাদন বৈশিষ্ট্য	পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য
দৈহিক বৃদ্ধির হার	ছাগল প্রতি মাংস উৎপাদন	বয়োসন্ধির বয়স
যৌন পরিপক্কতায় আসার বয়স ও ওজন	ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ	প্রথম প্রজননে আসার বয়স ও ওজন
জন্মকালীন বাচ্চার ওজন	চামড়ার গুণাগুণ	প্রথম গর্ভধারণের সময় বয়স ও ওজন
দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন	দুধ উৎপাদন	প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স
দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার	লোম উৎপাদন	কিডিং ইন্টারভ্যাল
	গুণগত মান	প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা
		পাঁঠার শুক্রাণুর গুনগত মান

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন ঃ প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স কমপক্ষে ১২-১৪ মাসের মধ্যে হওয়া উচিত।
- অন্ডকোষের আকার বড় ও সুগঠিত এবং পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত পাঁঠা অধিক উৎপাদনশীল বংশের, আকারে বড় ও শৌর্য্য বীর্যশীল হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী নানীকে বছরে ২ বার বাচ্চা এবং প্রতিবারে কমপক্ষে দুই বা ততোধিক বাচ্চা দেওয়া উচিত।
- নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ১০% এর নিচে হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী নানীকে দৈনিক কমপক্ষে ৭০০ গ্রাম দুধ হওয়া উচিত।
- পাঁঠা শারীরিকভাবে সুস্থ হবে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হওয়া উচিত।
- পাঁঠা রুক্ষ, আক্রমনাত্মক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত পাঁঠা সবরকমের যৌন রোগ মুক্ত হওয়া উচিত।

ব্লাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন ঃ প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ছাগীর বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে। দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে।
- ব্লাক বেঙ্গল জাতের হলে মাংসবহুল ছাগী নির্বাচন করতে হবে।
- দুধ উৎপাদনকারী জাতের হলে ওলান ও বাঁট বড় ও সুগঠিত হবে।
- ছাগীর পিতা-মাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি এমন ছাগী নির্বাচন করতে হবে। ছাগী অবশ্যই শান্ত প্রকৃতির হবে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও প্রজনন পাঁঠার যত্ন

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ ঃ

- ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায়।
- খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয়।
- মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে।
- সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে। অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয়।
- ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার (ভালভা) লাল হয় এবং ফুলে যায়।
- যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয়।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ ঃ

- ছাগী গরম হওয়ার ৮ ঘন্টা পর এবং ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয়।
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গভর্ধারণ নিশ্চিত করা যায়। সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন।
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে।
- একবার বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ছাগী পুনরায় গরম হয়।
- ছাগীকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠার প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

- উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ৪-৬ মাসের মধ্যেই পাঁঠা বাচ্চা পাল দেয়ার লক্ষণসমূহ দেখায়। তবে কখনোই ৮ মাসের বয়সের আগে (প্রায় ১৪-১৭ কেজি) পাঁঠা বাচ্চাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ৮-১২ মাস বয়সের মধ্যে কোন পাঁঠাকে ২০ টির অধিক পালে ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য পরবর্তীতে তা বাড়িয়ে প্রাপ্ত পাঁঠা সপ্তাহে ৪-৫ বার পালের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ১০০ টি ছাগী বিশিষ্ঠ খামারে সাধারণত ১০ টি প্রজননক্ষম পাঁঠার প্রয়োজন। এজন্য খামারে উৎপাদিত পাঁঠা থেকে ৫% বাছাই করে প্রজনন কাজের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত।
- একই পাঁঠা দিয়ে তার বাচ্চাকেও প্রজনন করা উচিত নয় এতে খামারে ইনব্রিডিং এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।
- একই বয়সী অন্যদের তুলনায় আকারে বড় আকর্ষণীয় নীরোগ এবং প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন পাঁঠাকেই ব্যবহার করা উচিত।

ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস (Mastitis) ঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ফাংগাস সহ ১৮-২০ ধরণের জীবাণু দ্বারা দুগ্ধবতী ছাগলের ম্যাস্টাইটিস বা ওলান প্রদাহ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে ছাগীর ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়, দুধ দোহন করলে পাত্রে দুধের তলানি পড়ে, দুধ উৎপাদন কমে যায়, দুধের স্বাদ লবণাক্ত হতে পারে, তীব্র প্রকৃতির রোগে ওলানের ভিতর পুঁজ হয়। পরে দুধের সাথে রক্ত আসে ও দর্গন্ধ হয়। ওলান ও বাটে ব্যাথা হয় দুধ দোহন করতে বা বাচ্চাকে টেনে খেতে দিতে চায় না। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়

- মাঝে মাঝে ওলানের প্রত্যেক কোয়ার্টারের দুধ কালো কাপড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন তলানি, পুঁজ বা রক্ত আছে কিনা, দুধের রং পরিবর্তন হয়েছে কিনা।
- ছাগীকে গাদাগাদি বা ঠাসাঠাসি করে রাখা যাবে না। প্রসবের আগে ও পরে ছাগীকে সমতল ও নরম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে।
- দুধ দোহনের সময় হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রয়োজনে সাবান বা ক্লোরিন সলিউশন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বড় ছাগল ছানাকে ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া যাবে না।

ধনুষ্টংকার/টিটেনাস ঃ যে কোন অপারেশন, খাসীকরণ, বাচ্চা প্রসবের সময় ছাগীতে বা ছাগল ছানার নাভীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে যদি ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে তখন টিটেনাস রোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের চোয়াল, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ির মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দাঁত লেগে যায় বলে ছাগল খেতে পারে না। খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে, প্রথম দিকে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং শেষ দিকে তাপমাত্রা কমে যায়, দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে যায়, পা ও ঘাঁড় শক্ত হয়ে যায় বলে আক্রান্ত ছাগল চলাফেরা করতে পারেনা এমনকি দাড়াতেও পারেনা। তীব্র আক্রান্ত ছাগল কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।
একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী টিটেনাস আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- খোঁজাকরণ, নাড়ি কর্তন, লোম কাটাসহ যে কোন ধরণের অপারেশনের সময় ছাগলকে টিটেনাস টক্সয়ড/এন্টি টিটেনাস সিরাম ইনজেকশন করতে হবে।
- ডেটল, সেভলন প্রভৃতি এন্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- এক বছর পরপর দু'বার ছাগীকে এন্টিটিটেনাস সিরাম/টিটেনাস টক্সয়ড ইনজেকশন প্রদান করলে এ রোগের আশংকা অনেক কমে যাবে।

তড়কা/এ্যানথ্রাক্স ঃ ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস নামক এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল লক্ষণ প্রকাশের আগেই অনেক সময় মারা যায়। ছাগল টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাপাঁতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায় এবং মারা যায়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৩-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট), খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, জাবর কাটে না, শ্বাসকষ্ট হয়, নাক মুখ দিয়ে লালা পড়ে, পেট ফুলে ওঠে, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয়। রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মল কালো হতে হতে আলকাতরার মত হয়ে যায়। মরা ছাগলের নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয়। তড়কা একটি মারাত্মক ব্যাধি। রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী তড়কা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়

- মৃত ছাগলকে মাটিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গর্তে বা চুন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তার উপর মৃতদেহ রেখে মৃতদেহের উপর আবার চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না। কারণ চামড়া এ রোগের জীবাণু বহন করে।
- আক্রান্ত প্রাণি বা মৃতদেহ কোন অবস্থাতেই ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না।
- মৃত ছাগলের ব্যবহৃত সকল জিনিস পুড়ে ফেলতে হবে।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত প্রাণিকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে।
- অসুস্থ্য ছাগলকে বিক্রি করা যাবে না। অসুস্থ্য ছাগলকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করানো যাবে না।
- সুস্থ্য ছাগলকে নিয়মিত (১ বছর পর পর) এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

এন্টারোটক্সিমিয়া ঃ ক্লোস্ট্রিডিয়াম প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট টক্সিন দ্বারা এন্টারোটক্সিমিয়া রোগ দেখা দেয়। পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যবস্তু এ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল শরীরের ভার বহন করতে পারে না, চারণ-ভূমিতে হাটতে হাটতে কাপঁতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, পেট ফুলে উঠে, ডায়রিয়া হয়। তীব্র প্রকৃতির রোগে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে মারা যায়। রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টারোটক্সিমিয়া আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে।

ক্ষুরারোগ ঃ ক্ষুরারোগ ছাগলের একটি ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। এ রোগে মৃত্যুর হার কম হলেও উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, গর্ভবতী ছাগীর গর্ভপাত হয়, শরীরে কাপটুনি দিয়ে জ্বর আসে, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখের ভিতরের পর্দায়, জিহ্বায়, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের ফাঁকে এমনকি ওলানে ফোস্কা পড়ে। মুখে ঘায়ের কারণে ছাগল খেতে পারে না, ফলে দূর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষুরে ঘা হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে। আক্রান্ত ক্ষতে মাছি ডিম পাড়লে পোকা হতে পারে। বাচ্চা ছাগলে এ রোগ হলে হার্ট আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে পৃথক করে সাপোর্টিভ চিকিৎসা প্রদান করতে

হবে। কুসুম গরম পানিতে ফিটকিরি বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে মুখের ও পায়ের ঘা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ছাগলের ঘর ২% অ্যোসান বা অন্যান্য ডিসইনফেকট্যান্ট দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের মল মূত্র, বিছানা ও ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মৃত ছাগলকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না এবং পথে ঘাটে ফেলা যাবে না। অসুস্থ্য ছাগলকে স্থানান্তর করা যাবে না এবং বাজারে বিক্রি করা যাবে না।

পিপিআর ঃ পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের জীবাণু ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্রুত চিকিৎসা না করালে ছাগল মারা যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে এবং নাকের ভিতরে শ্লেষ্মা জমে যায়, পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া দেখা দেয়, জিহবা, দাঁতের মাড়ি, মাজল ও মুখের ভিতর ঘা হয়, মলের রং গাঢ় বাদামী হয় এবং মলের সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মিশানো মিউকাস আসে। শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। চিকিৎসায় বিলম্ব হলে ৫-১০ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায়। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী পিপিআর আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাচ্চার ৪ মাস বয়সে টিকা প্রদান করতে হয়। অনেক সময় ঝুঁকি এড়াতে বাচ্চার ২ মাস বয়সে টিকা দেওয়া হলে পুনরায় ৪ মাস বয়সে বুষ্টার ডোজ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। একবার টিকা দিলে ১ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ ঃ কন্টাজিয়াস একথাইমা হচ্ছে ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের নাক ও মুখের চারদিকে ফুঁসকুড়ি হয়। ঠোঁট ও মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতের উপর মরা চামড়ার আবরণ থাকে যা সরিয়ে দিলে লাল ক্ষত দেখা যায়। ক্ষতের জন্য ঠোঁট ফুলে যায়। অনেক সময় চোখ, ওলান, মলদ্বার ও পায়ের খুরের উপরের চামড়ায় ফুঁসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে। ফোস্কা ফেটে তরল আঠাল পদার্থ করতে থাকে এবং প্রদাহ হয়। অনেক সময় এই ক্ষত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কন্টাজিয়াস একথাইমা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আক্রান্ত ক্ষত ফিটকিরি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত স্থানে মিথাইল ব্লু বা ক্রিষ্টাল ভায়োলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানার ১-২ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ১০-১৪ দিন বয়সে ২য় ডোজ এবং ৩ মাস পর ৩য় ডোজ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

গোটপক্স ঃ গোট হচ্ছে ছাগলের একটি অন্যতম মারাত্মক ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের জ্বর হয়। চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ দিয়ে লালা করে। আক্রান্ত ছাগলের সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে। সাধারণত মুখের চারপাশে, নাকে, মাজলে, মুখের ভিতরে দাঁতের মাড়িতে, কানে, গলায়, ওলানে ও বাঁটে পশম কম এমন জায়গায় বসন্তের গুটি বা ফোস্কা দেখা যায়। বসন্ত রোগ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী বসন্ত আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আক্রান্ত ক্ষতে এন্টিবায়োটিক পাউডার বা কর্টিসোন ক্রিম লাগানো যেতে পারে। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ্য ছাগলকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। সুস্থ্য ছাগলকে গোট পক্স টিকা প্রদান করতে হবে।

পরজীবীজনিত রোগ ঃ ক) কৃমি-নানা ধরণের কৃমি ছাগলের পেটের ভিতরে বসবাস করে। এগুলো অন্তঃপরজীবী। ছাগলের দেহের খাবারের ভাগ বসিয়ে এর প্রাণীকে দুর্বল করে দেয় বিশেষ করে হজমের গন্ডগোল করে।

লক্ষণসমূহ-

- ছাগলের ক্ষুধা কমে যায়, বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে।
- বদ হজমের কারণে ছাগলের চিরাচরিত গুটির মত পায়খানা হয় না।
- চোয়াল ও পেটের নিচের দিকে ফুলে যায়।
- মলে কৃমি দেখা যেতে পারে। আনুবিক্ষণিক পরীক্ষায় মলে অবশ্যই কৃমির ডিম দেখা যাবে।

একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। জলাশয়ের কাছের ঘাস খাওয়ালে কৃমির আক্রমন কিছুটা হ্রাস পায়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঋতুভিত্তিক কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

খ) বহিঃপরজীবী- (১) উঁকুন- উঁকুন ছাগলের বহিঃপরজীবী। উঁকুন আশ্রয়দাতা ছাগলের দেহে জীবন অতিবাহিত করে।

লক্ষণসমূহ-

- উঁকুনের আক্রমণে ছাগলের অস্থিরতা বাড়ে। ছাগল ঠিকমত শুতে ও ঘুমাতে পারে না।
- খাবার খেতে চায় না, রোগা হয়ে যায় ও রক্তের অভাব দেখা যায়।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক দিতে হবে।

(২) এটুলি বা টিক পোকা- বহিঃপরজীবী পোকাদের মধ্যে এটুলি মারাত্মক ধরনের রক্তচোষক।

লক্ষণসমূহ-

- এটুলিকে খালি চোখে দেখা যায়, এরা ত্বকের সাথে পাগুলি দিয়ে আটকে থাকে।
- এদের আক্রমণে ছাগল অস্বস্তি বোধ করে। আক্রমন মারাত্মক হলে দেহের বৃদ্ধি ও দুধ কমে যায়।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে।

(৩) চর্মরোগ- সারকোপটিক বা সরোপটিক মাইট দিয়ে থাকে। ছাগলের গায়ে প্রচন্ড চুলকানি হয়। চামড়ার লোম উঠে যায় এবং তা মোটা ও খসখসে হয়ে যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে।

অধিবেশন-৮ ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও জীব-নিরাপত্তা

রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা। কোন সুস্থ্য প্রাণীকে রোগ হওয়ার পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট রোগের টিকা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত রোগ হতে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনেশন বলে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়ে ওঠে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনও কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, কখনও কয়েক বছরহতে আজীবন কাল হতে পারে।

ভ্যাকসিনেশনের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

- সুস্থ্য প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে। অসুস্থ্য প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করা নিরাপদ নয়।
- পরজীবী আক্রান্ত প্রাণিকে ভ্যাকসিন ভাল কাজ করে না। তাই ভ্যাকসিন প্রয়োগের পূর্বে প্রাণিকে পরজীবি মুক্ত করে নিতে হবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ভাল কোম্পানী হতে ভ্যাকসিন সংগ্রহ। মেয়াদোত্তীর্ণ ভ্যাকসিন কোন কাজে আসে না বরং ক্ষতিকর।
- ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার বা পাতিত পানি ব্যবহার করতে হবে। পুকুর, নদীনালা, ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করলে ভ্যাকসিনের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- পানিতে গুলানো ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে (গুলানোর সর্বোচ্চ ১ ঘন্টার মধ্যে)
- ভ্যাকসিন নির্দেশনানুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবহনের সময় থার্মোফ্লাক্সে পরিবহন করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণ ঃ

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমান
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস	৬মাস পরপর	চামড়ার নিচে	মনো-১মিলি বাই-২ মি.লি. ট্রাই-৩মিলি
গোট পক্স টিকা	৪ মাস	৬ মাস পরপর	চামড়ার নিচে	১মিলি
জলাতংক টিকা	৪ মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া না হলে) ৯ মাস মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া হলে) ১ বছর পর বুষ্টারডোজ	১ বছর পর	চামড়ার নিচে/ মাংসপেশীতে	১মিলি
অ্যানথ্রাক্স টিকা		১ বৎসর	চামড়ার নিচে	০.৫ মি.লি
গলাফুলা টিকা	৬মাস	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	২মিলি
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে		মাংশে	১মিলি
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন (১ম ডোজ)	১০-১৪ দিন (২য় ডোজ) ৩ মাস (৩য় ডোজ) ১২ মাস (পরবর্তী ডোজ)	উৎপাদনকারীর নির্দেশনামত	

জীব-নিরাপত্তা ঃ খামার এলাকার বেড়া বা নিরাপত্তা বেষ্টনী এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সেখানে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি, শেয়াল-কুকুর ও অন্যান্য বণ্যপ্রাণি প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশ পথে ফুটবাথ বা পা ধোঁয়ার জন্য ছোট চৌ-বাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের আগে খামারে গমনকারী তার জুতা/পা ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করবেন। নতুন আনীত ছাগলকে স্বতন্ত্র ঘরে সাময়িক ভাবে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ঘরকে পৃথকীকরণ ঘর বা আইসোলেশন শেড বলে। অন্তত ঃ দুই সপ্তাহ এই শেডে রাখা বিশেষ জরুরী। এসব ছাগলের জন্য প্রাথমিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে এদেরকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। এজন্য বহিঃপরজীবি এবং অন্তঃপরজীবীর জন্য কার্যকর কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। চর্মরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ছাগলকে (০.৫%) শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ ম্যালাথিয়ন দ্রবণে গোসল করাতে হবে। আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোনো রোগ না দেখা দেয় তাহলে প্রথমে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন এবং সাত দিন পর গোটপক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। শেষ টিকা প্রদানের সাত দিন পর এসব ছাগলকে মূল খামারে নেয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সকাল এবং বিকালে ছাগলের ঘর পরিষ্কার করতে হবে। কোনো ছাগল যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে আলাদা করে আইসোলেশন শেডে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনো ছাগল মারা যায় তবে অবশ্যই তার কারণ সনাক্ত করতে হবে। ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের পর তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিশেষ করে অন্যান্য ছাগলের জন্য নিতে হবে। মৃত ছাগলকে খামার থেকে দূরে নিয়ে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের ব্যবহার্য সকল সরঞ্জামাদি ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

বকনা পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ গাভী পালনের গুরুত্ব ও জাত পরিচিতি

গাভী পালনের উদ্দেশ্য

- একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধ ও ১২০ গ্রাম মাংসের প্রয়োজন;
- দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধ ও মাংসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে দুধ ও মাংসের ব্যাপক চাহিদা পূরণ করতে হলে আরও অনেক গাভীর খামার স্থাপন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- গাভীর খামার বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্যবিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশে দুধের চাহিদা পূরণে বিশাল ভূমিকা রাখছে;
- একটি পারিবারিক গাভীর খামার স্থাপন করতে বেশি জমির প্রয়োজন হয় না। গাভীর খামার স্থাপনে তেমন কোনো ঝুঁকি নেই;
- প্রয়োজনে দেশি ঘাস সংগ্রহ করে খাওয়ালেও চলে। অল্প পুঁজি দিয়ে গাভীর খামার শুরু করা যেতে পারে;
- একটি পারিবারিক গাভীর খামার দেখাশোনা করার জন্য আলাদা শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না;
- মানুষের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গাভী দ্বারা আঁশজাতীয় খাদ্য এবং মানুষের খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশকে যথাযথ ব্যবহার করা যায়;
- ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে গাভীর খামারের গুরুত্ব অপরিসীম; গোবর দ্বারা বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করে জ্বালানি ও আলোর ব্যবস্থা করা যায়;
- পর্যাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী যেমন- দই, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি উৎপাদনের ফলে দুগ্ধ খামার স্থায়ী ভালো বাজার সৃষ্টি করতে পারে;
- ষাঁড় বিক্রি করে আয় বৃদ্ধি করা যায়। পরিকল্পিতভাবে গাভী পালন লাভজনক কার্যক্রম। অল্প মাঝারি বেশি সব ধরনের পুঁজি দিয়ে সুষ্ঠুভাবে গাভী পালন করলে অনেক লাভবান হওয়া যায়।

উন্নত জাতের গরু নির্বাচনঃ আমাদের দেশ অধিক পরিমান দুধ উৎপন্ন করে এমন গরুর জাত হিসাবে শাহীওয়াল, সিন্ধি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গরু পরিচিত। দেশী জাতের মধ্যে শাহজাদপুর, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারিপুর এবং চট্টগ্রাম এলাকায় গরু দেশের অন্যান্য এলাকার গরু অপেক্ষা উন্নত ও দুধ বেশী দেয়।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শাহিওয়াল জেলায় উৎপত্তি লাভ করে। জেবু জাতের গরুর মধ্যে শাহিওয়াল গরুই সব থেকে বেশি দুধ উৎপাদন করে। ধীর ও শান্ত প্রকৃতির, মোটাসোটা ভারী দেহ, ত্বক পাতলা ও শিথিল। পা ছোট, শিং ছোট ও পুর, এজাতের গাভীর শিং নড়ে, মাথা চওড়া। ষাঁড়ের চূড়া অত্যাধিক বড়। গলকম্বল বৃহদাকার যা ঝুলে থাকে, লেজ বেশ লম্বা, প্রায় মাটি ছুঁয়ে যায়। ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৫২০- ৫০০ কেজি এবং গাভীর ৪০০ ২৫০ কেজি পর্যন্ত হয়।শাহীওয়াল গাভী দুধ উৎপাদনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট জাত। এ জাতের গাভী গ্রামীণ অবস্থায় পালনে ৩০০ দিনে প্রায় ২১৫০ লিটার দুধ দেয়। খামারে পালনকারী গাভী প্রায় ৫-৪ হাজার লিটার দুধ দিয়ে থাকেও	
গরুর নাম : ফ্রিজিয়ান জাতের গরু হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু তাদের সাদা কালো রং এর কারণে সহজেই চোখে পড়ে। একটা হলস্টেইন জাতের পূর্ণ বয়স্ক গাভীর ওজন ৮০০-৬০০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ১১০০-৭০০ কেজি পর্যন্ত হয়। একটা হলস্টেইন গাভীর বাছুর এর ওজন ৪০ থেকে ৬০ কেজি পর্যন্ত হয়। একটি স্বাস্থ্যকর হলস্টাইন বাছুরের জন্মের পর প্রায় ১৫ মাস বয়সে বংশবৃদ্ধির উপযোগী হয়। এক ল্যাক্টেশন পিরিয়ড (৩১০-৩০০ দিন) এ হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান গরু গড়ে ৯,০০০ থেকে ১২,০০০ কেজি দুধ দেয়। পৃথিবীর মোট গরু পালনের %৫০ এর উপরে শুধু এই জাত পালন করা হয়। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় সাইজে বেশ বড় হওয়ায় মাংস উৎপাদন ও সন্তোষজনক।	
গরুর নাম : পাবনা ক্যাটল বা পাবনা জাতের গরু সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় এ জাতের গরু পাওয়া যায়। জমিদারি আমলে ভারত থেকে অধিক উৎপাদনশীল গরু এদেশে আমদানি করা হয় এবং স্থানীয় জাতের সাথে দীর্ঘদিন সংকরায়নের ফলে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ জাতের গরু তৈরি হয়। বৈশিষ্ট্য- পাবনা জাতের গরুর গায়ের রঙ লাল অথবা ধূসর। আবার দুই রঙের মিশ্রণও হতে পারে। ষাঁড়ের গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর থেকে বিভিন্ন মাত্রায় সাদা হতে পারে। এ গরুর নাক ও মুখের সামনের অংশ (ঠোঁট), চোখের পাতা, ক্ষুর, শিং এবং লেজের পুচ্ছ কালো বর্ণের হয়। বকনা গরুর শরীরের আকার আকৃতি দুধেল জাতের গরুর মতোই। ষাঁড়ের আকার বেশ বড় এবং মাংসের জন্য পালন করার জন্য উপযুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ৪০০-৩৫০ কেজি, আর বকনার ওজন ২৮০-২৫০ কেজি।	
অরসিসি বা রেড চিটাগাং অরসিসি বা রেড চিটাগাং ক্যাটেল/অষ্টমুখী লাল গরু/লাল বিরিষ জাতের গরু চট্টগ্রামের বিশেষ জাতের সুদর্শন গরু। এ জাতের গরু চট্টগ্রাম ছাড়া পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী ও কুমিলা জেলায়ও কিছু সংখ্যক দেখা যায়। হালকা লাল বর্ণের এ জাতের গরু দেখতে ছোটো খাটো, পেছনের দিক বেশ ভারী, চামড়া পাতলা, শিং ছোটো ও চ্যাপ্টা। এদের মুখ খাটো, চওড়া, মাঝারি ধরনের গলকম্বল, গলাখাটো ও সামান্য কুঁজ আছে। ওলান বেশ বর্ধিত, বাট সুডৌল, দুগ্ধ শিরা স্পষ্ট, গাভী অনুপাতে লেজ যথেষ্ট লম্বা, শেষ প্রান্তের লেজের গুচ্ছ লাল বর্ণের। প্রজনন অঙ্গ লাল বর্ণের গরুর দৈহিক ওজন ৩০০-২০০ কেজি। দুধ উৎপাদন ২.২ কেজি। দুগ্ধদান কাল ২৬০ দিন। এক বিয়ানে -৫০০ ৬০০ কেজি দুধ পাওয়া যায়।	

অধিবেশন-২ বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

আদর্শ ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমেই দুধ, মাংস উৎপাদন তথা গাভীর খামারকে লাভজনক করা সম্ভব।

খামারের সঠিক স্থান নির্বাচন

- ❖ শুষ্ক ও উঁচু ভূমি -পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভালো হতে হবে
- ❖ সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা - প্রয়োজনীয় জমির প্রাপ্যতা
- ❖ সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা- পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ
- ❖ মাটির প্রকৃতি ভালো হতে হবে- আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকা।
- ❖ জনবসতি থেকে দূরে
- ❖ রাস্তা থেকে দূরে

গরু পালনে শেড তৈরির কৌশল ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাঃ যারা নিজের বাড়িতে গবাদিপশু পালন করার পরিকল্পনা করেছেন তারা অনেকেই ভাবেন কিভাবে গরুর ঘর তৈরি করবেন। এ বিষয়টি নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

- ❖ গরু পালনে শেড নির্মাণের জন্য বাড়িতে যেখানে আলো বাতাস চলাচল করতে পারবে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে। এতে খামারের গরু প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাস পাবে। ফলে গরু সুস্থ থাকবে ও রোগে আক্রান্ত হবে কম।
- ❖ শেড তৈরির জন্য নির্ধারিত জায়গায় ৬-৮ ইঞ্চি বালি ফেলতে হবে এবং একটু ঢালু করে নিতে হবে যাতে পানি খুব তাড়তাড়ি চলে যায়। এতে খামারে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর হয়ে যাবে ও শেড শুকনো থাকবে।
- ❖ গরুর জন্য নির্ধারিত জায়গার উপর ইট বিছিয়ে দিতে হবে এবং ১ থেকে ১ ১/২ সে:মি ফাঁকা রাখতে হবে। বালি সিমেন্ট পরিমান মত নিয়ে ইটের উপর দিয়ে একটি বস্তা দিয়ে লেপে দিতে হবে।
- ❖ প্রত্যেকটি গরুকে আলাদা করে রাখার জন্য জিআইপাইপ দিয়ে পার্টিশন দেয়া হয়, পার্টিশনের পাইপ লম্বায় ৯০ সে.মি. এবং উচ্চতায় ৪৫ সে.মি. হওয়া প্রয়োজন, একটি গরুর দাঁড়াবার স্থান ১৬৫ সে.মি., পাশের জায়গা ১০৫ সে.মি., খাবার পাত্র ৭৫ সে.মি. হওয়া প্রয়োজন, এবং গরুর পাশে একটু নিচু ওপর পাশে একটু উঁচু রাখতে হবে।
- ❖ একই মাপে গরুর সংখ্যা অনুযায়ী জায়গা নির্ধারণ করে ঘর তৈরি করতে হবে। এতে প্রত্যেক গরু থাকার ও চলাফেরা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা পাবে।
- ❖ শেডে গরু বাঁধার জন্য খাবার পাত্রের সাথে একটি করে রিং লাগিয়ে নিতে হবে।
- ❖ শেডের পাশ দিয়ে একটি ড্রেন রাখতে হবে যাতে করে মূত্র বা পানি নেমে যেতে পারে। এতে শেডের ভিতরে শুকনো থাকতে সহায়তা করবে। আর পানি বা মুত্রকে একটি নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে হবে।

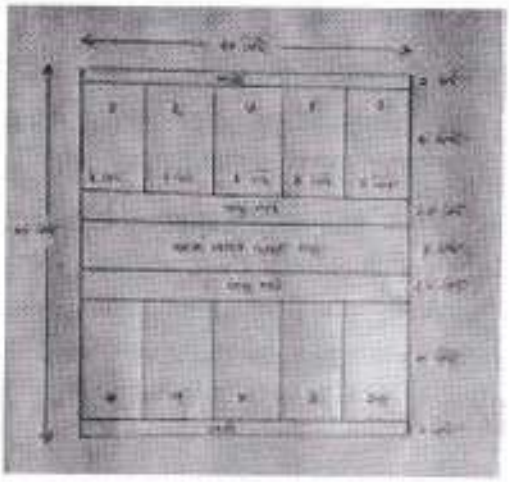

অধিবেশন-৩ গাভীর খাদ্য ব্যাবস্থাপনা

গরুর সুষম খাদ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হলো খড়, সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য এবং পানি।

১০০ কেজি দৈহিক ওজন বিশিষ্ট একটি গরুর জন্য সাধারণত ১-২ কেজি খড়, ৫-৬ কেজি সবুজ ঘাস এবং ১-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হয়।

দানাদার খাদ্য মিশ্রনে

- ❖ গমের ভূষি ৫০%
- ❖ চাউলের কুঁড়া ২০%
- ❖ খেসারি ভাঙ্গা ১৮%
- ❖ খৈল ১০%

খনিজ মিশ্রণ ১% এবং আয়োডিনযুক্ত লবন ১% থাকা প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষেত্রে প্রথম ৩ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ৩ কেজি দানাদার খাদ্য এবং পরবর্তী প্রতি ১ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ০.৫ কেজি হারে দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

নিম্নে ২৫০- ৩০০ কেজি দৈহিক ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর (দৈনিক দুধ উৎপাদন ১৩ লি.) জন্য সুষম খাদ্য তালিকা দেয়া হলো।

- ❖ কাঁচা সবুজ ঘাস ৯-১২ কেজি
- ❖ শুকনো খড় ৩-৪ কেজি
- ❖ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ৪-৭ কেজি

গাভীর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে খাদ্যে পাচ্যতা, পুষ্টিগুণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

নিচে ১০০ কেজি দানাদার খাদ্যে তালিকা দেওয়া হল:

- ❖ গম ভাঙা/গমের ভূসি-৪০ কেজি;
- ❖ চালের কুঁড়া-২৩.৫ কেজি;
- ❖ খেসারি বা যেকোনো ডালের ভূসি-১৫ কেজি:
- ❖ তিলের খৈল/সরিষার খৈল-২০ কেজি; লবণ-১.৫ কেজি।

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্রকে ঘাসের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর পরিমান দিনে ৩-৪ কেজির উর্ধ্বে হওয়া যাবে না। ৩-৪ কেজির বেশি ইউরিয়া মিশ্রিত খড় খাওয়ালে গরুতে ইউরিয়া বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কারণ একটি গরু মিশ্রিত উপকরণের সাথে দৈনিক গড়ে ৫০-৬০ গ্রাম ইউরিয়া শরীরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করতে পারে। এর বেশি ইউরিয়া খাওয়ালে পশুতে বিষক্রিয়া হয়।

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র সব ধরণের গরুকে খাওয়ানো যায়। ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খাওয়ালে খড়ের পরিপাচ্যতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ খড় খায়ালে খড়ের পরিপাচ্যতা মাত্র ৩০%। আর ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খাওয়ালে খড়ের পরিপাচ্যতা পাওয়া যায় প্রায় ৭০%। এতে এক দিকে যেমন গরুর পুষ্টিগুন বেশি পাওয়া যায় অপর দিকে খরচও কম হয়। ফলে খামারি লাভবান হয়।

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরির কৌশল ঃ ১০ কেজি শুকনো খড় টুকরো টুকরো করে কেটে পরিষ্কার পলিথিনের উপর রাখতে হবে। ৫-৭ লিটার পানি একটি বালতিতে নিয়ে তার মধ্যে ২.৫ কেজি (আড়াই কেজি) চিটাগুড় মিশাতে হবে। চিটাগুড় মিশ্রিত হলে এর সাথে ২৫০-৩০০ গ্রাম ইউরিয়া মিশাতে হবে। এখন ইউরিয়া এবং চিটাগুড় মিশ্রিত পানির দ্রবণটি ১০ কেজি খড়ের সাথে এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে সমস্ত পানি খড় শুষে নেয় যেন বাড়তি পানি নিচে জমা না থাকে। তৈরি করা ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র সাথে সাথে গরুকে খাওয়ানো যায় এবং একবার তৈরি করলে ৩ দিন পর্যন্ত খাওয়ানো যায়। তাই পালের গরুর সংখ্যা ও সাইজ অনুযায়ী ৩ দিন খাওয়ানো যায় এমন পরিমান খড় একবারে তৈরি করলে ভলে হয়।

অধিবেশন-৪ গরুর জাত উন্নয়ন ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা

কৃত্রিম প্রজননঃ গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ষাঁড় ব্যবহার করে বহুসংখ্যক গাভীকে পাল দেওয়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন কৌশলটি ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির প্রতিশ্রুতি জনপ্রিয়তার তিনটি ভিত্তি রয়েছে:

- ❖ এটি সহজ
- ❖ তুলনামূলক ভাবে খরচ কম
- ❖ সফল হলে ফলাফল অনেক ভালো।

বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র, গরম হওয়ার লক্ষণ ও করণীয় ঃ বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র - বয়ঃপ্রাপ্তির পর বকনা বা গাভী জাতীয় গবাদিপশু কামোদ্দীপ্ত হয়ে উঠে অর্থাৎ ষাঁড়ের সাথে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই কামোদ্দীপনাকেই 'গরম হওয়া' বা ডাকে আসা নামে অভিহিত করা হয়। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যা বকনা বা গাভীর প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে পর্যায়ক্রমিকভাবে শারীরবৃত্তীয় ও আকৃতিগত পরিবর্তন আনে। এই সাময়িক পরিবর্তনগুলো পরবর্তীতে গরম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এবং এই সময়কালকেই ঋতুচক্র বলে।

বকনা বা গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণ :

- ❖ বকনা বা গাভী অশান্ত থাকবে এবং একজায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করবে।
- ❖ গরম হওয়ার শুরুতে নিজে অন্য পশুর উপর লাফ দিবে এবং পুরোপুরি গরম অবস্থায় অন্য পশুকে নিজের উপর লাফ দিতে উদ্বুদ্ধ করবে।
- ❖ অন্য পশুকে নিজের পশ্চাৎদেশ চাটতে দিবে।
- ❖ দুধালো গাভীর ক্ষেত্রে হঠাৎ করে দুধ কমে যাবে।
- ❖ খাওয়ার আগ্রহ কমে যাবে।
- ❖ বকনা বা গাভীকে খুবই সতর্ক মনে হবে এবং সবসময় কান খাড়া করে থাকবে।
- ❖ ঘনঘন অল্প পরিমাণে প্রস্রাব ও পায়খানা করবে, লেজ নাড়াতে থাকবে।
- ❖ যোনি পথ দিয়ে স্বচ্ছ মিউকাস বা শেষ্মা বের হবে।
- ❖ বকনা বা গাভী হাম্বা হাম্বা করে অনবরত ডাকতে থাকবে।

বকনা বা গাভী গরম হওয়ার পর করণীয় : বকনা বা গাভীর গরম অবস্থায় প্রধান কাজ হলো পাল দেওয়ানো। এজন্য প্রথমেই পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ণয় করতে হবে। সাধারণত গাভী গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর থেকে পরবর্তী ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলেই চলে। কিন্তু ভালো ফলাফল পাবার (১২-১৮) ঘন্টা সময়ের মধ্যে এআই করা ভালো।

গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় ঃ গাভীকে পাল দেওয়া থেকে বাচ্চা প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে গর্ভধারণকাল বলে। গাভীর গর্ভধারণকাল ২৮০ + ১০ দিন। গর্ভধারণ নির্ণয় একটি জটিল বিষয়। অথচ সাফল্যজনক খামার ব্যবস্থাপনায় পাল দেওয়ার পর গাভী গর্ভবতী হয়েছে কিনা এটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণত পাল দেওয়ার ৬-১২ সপ্তাহ পর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

গর্ভাবস্থার বাহ্যিক লক্ষণঃ

- ❖ গর্ভধারণের প্রাথমিক চিহ্নই হলো গাভীর ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া। পাল দেওয়ার পর ঋতুচক্র বন্ধ হলে স্বাভাবিকভাবেই গাভীটি গর্ভবতী হয়েছে বলে মনে করা হয়।
- ❖ গাভী নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে।
- ❖ গাভীর দেহে চর্বি জমতে শুরু করে।
- ❖ ভ্রূণের বৃদ্ধি এবং ওলান ও জরায়ু স্ফীত হওয়ার কারণে গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি সময় থেকে গাভীর দৈহিক ওজন বাড়তে থাকে।
- ❖ গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গাভীর তলপেটের আয়তন বেড়ে যায়।
- ❖ গাভীর ওলান দৃঢ়, চকচকে এবং আকারে বড় হয়। আর বাঁটগুলো তৈলাক্ত মনে হয়।

অধিবেশন-৫ গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা, প্রসবকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

গর্ভকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা ঃ গাভীর গর্ভধারণকাল গড়ে ২৮০ দিন। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই পাল দেওয়া হোক না কেনো কখন পাল দেওয়া হয়েছে সেই সময়টি মনে রাখতে হবে এবং প্রতিটি গাভীর স্বাস্থ্যরেকর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে গাভী গর্ভধারণ করেছে কিনা এই বিষয়টিও নিশ্চিত হতে হবে। দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ৬ মাস পর্যন্ত যত্ন, পরিচর্যা, খাদ্য সরবরাহ ও দুধ দোহন স্বাভাবিকভাবেই চলবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে গর্ভবতী গাভীকে দৈনিক খাদ্যের অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে। গাভীর ওজন ৩০০-২০০ কেজি হলে ১.০-০.৫ কেজি, ৪০০-৩০০ কেজি হলে ১.৫-১.০ কেজি এবং ৫০০-৪০০ কেজি হলে ২.৭৫-১.৫ কেজি দানাদার মিশ্রণ দিতে হবে। বয়সভেদে অতিরিক্ত এই খাদ্য চাহিদাকে প্রেগ্নেন্সি এ্যালাউন্স বলে। গর্ভবতী গাভীকে এই বয়সে খাদ্য প্রদানে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো:

- ❖ গাভীর কোনভাবেই চর্বি জমতে দেওয়া যাবে না এবং
- ❖ দানাদার মিশ্রণের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

তবে বকনা বাছুরের ক্ষেত্রে পাল দেওয়ার পর থেকেই সুষম খাদ্য সঠিক পরিমাণে সরবরাহ করা উচিত। কারণ এই সময় গর্ভের বাচ্চা ও বকনা বাছুরের শরীরের বৃদ্ধি একই সাথে ঘটে থাকে।

গর্ভবতী বকনা বা গাভীকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা উচিত। গর্ভাবস্থায় বকনা/গাভী যেনো প্রচুর পরিমান পরিষ্কার পানি খেতে পারে সেব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রসবকালীন গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা ঃ প্রসবের কিছু সময় পূর্ব থেকেই গাভীতে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে

- ❖ ওলান ফুলে যায়, ভালভা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৬ গুণ বেশি ফুলে যায় এবং লেজের গোড়ার দিকে রস বের হতে থাকে।
- ❖ এই সময় গাভীকে প্রসূতি ঘরে নেওয়া উচিত।
- ❖ প্রসূতি ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে এবং আলো-বাতাস চলাচলের ও ভালো বিছানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ❖ আবার বর্ষাকাল এবং শীতকাল ব্যাতিত অন্য সময়ে খামারের কাছাকাছি পরিষ্কার, ছায়াযুক্ত এবং ঘাস আছে এমন স্থানেও নেওয়া যেতে পারে। প্রসবের সময় গাভীর প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে।
- ❖ সাধারণত প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পাবার ১ থেকে ২ ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চা প্রসব হয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রসব ব্যাথা শুরু হওয়ার ৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা প্রসব না হয় তবে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।
- ❖ স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে সাহায্য ছাড়াই গাভী সাধারণত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তবে অনেক সময় হাত দিয়ে সামান্য সাহায্য করতে হয়। প্রসবের শুরুতেই বাচ্চার সমনের পা বেরিয়ে আসে, এরপর আসে নাক।
- ❖ যেকোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই জরুরী ভিত্তিতে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।

প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যাঃ

- ❖ বাচ্চা প্রসবের পরপরই নিমপাতা বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক (Flank) এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।
- ❖ গাভীর যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ❖ বাচ্চা প্রসবের পরপরই গাভীকে হালকা গরম পানি বা এধরনের পানি দিয়ে গুড়ের সরবত তৈরি করে খাওয়ানো ভালো।
- ❖ গাভী যাতে নবজাতক বাছুরকে চাটতে পারে এজন্য বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিতে হবে।
- ❖ প্রসবের পরপরই গাভীকে আংশিকভাবে দোহন করতে হবে।
- ❖ সাধারণত প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুল (Placenta) বের হয়ে যায়। যদি ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও গর্ভফুল বের না হয় তবে গাভীকে আরগট মিশ্রণ খাওয়ানো যেতে পারে।
- ❖ ১২ ঘন্টার পরেও গর্ভফুল বের না হলে প্রাণি হাসপাতালের ভেটেরিনারি সার্জনের সাহায্য নেওয়া উচিত।
- ❖ গর্ভফুল বের হওয়ার সাথে সাথে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ❖ গাভী যেনো গর্ভফুল না খেয়ে ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- ❖ দুধজ্বর ও ম্যাস্টাইটিস রোগের সম্ভাবনা কমাবার জন্য বাচ্চা প্রসবের পর ১-২ দিন পর্যন্ত গাভীকে সম্পূর্ণভাবে দোহন না করাই ভালো। বাছুরকে কাচলা দুধ বা কলস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওলানের বাঁট চুষতে দিতে হবে।
- ❖ গাভীকে প্রথমত হালকা গরম পানিতে গমের ভূষি ভিজিয়ে খেতে দিতে হবে। একইসাথে অল্পপরিমান কাঁচা ঘাসও খাওয়ানো যেতে পারে।
- ❖ বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

দানাদার খাদ্যের পরিমান এমনভাবে বাড়াতে হবেযাতে বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

দুধ দোহন ঃ যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাকে দুধ দোহন বলে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে গাভী থেকে দ্রুত দুধ দোহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে গাভী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

অধিবেশন-৬ বাছুর পালন, বাছুরের পরিচর্যা

একটি গাভীর খামার কতোটা সফলতা লাভ করবে তা নির্ভর করে ঐ খামারে বাছুর কিভাবে পালন করা হচ্ছে। ভালো গাভী কখনোই ক্রয় করা যায় না, খামারে তৈরি করতে হয়। অব্যবস্থাপনার কারণে আমাদের দেশে বাছুরের মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। একটি ভালো গাভী যেমন একটি ভালো বাছুরের জন্ম দেয় তেমনি একটি ভালো বাছুর একটি ভালো গাভী হতে পারে।

সাধারণত দু'ভাবে বাছুর পালন করা হয়ে থাকে-

- ❖ বাছুরকে তার মায়ের কাছে থাকতে দেওয়া হয় এবং দোহনের পূর্বে ও পরে অল্প পরিমাণে মায়ের দুধ পান করতে দেওয়া হয়
- ❖ গাভী থেকে পৃথক রেখে বাছুর পালন : এক্ষেত্রে জন্মের ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বাছুরকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
- ❖ অনেকে আবার কলস্ট্রাম খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত বাছুরকে মায়ের কাছে রেখে দেয়। পরবর্তীতে একেবারে পৃথকভাবে বাছুরের খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটির নাম "দুধ ছাড়ানো পদ্ধতি" বা উইনিং সিস্টেম।
- ❖ এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অধিক বিজ্ঞানসম্মত।

জন্মের পরপরই বাছুরের যত্নঃ

- ❖ বাছুর জন্মানোর পরপরই তার নাক-মুখ থেকে শেষ্মা পরিষ্কার করে গাভীকে চাটতে দিতে হবে।
- ❖ শীতকালে খেয়াল রাখতে হবে যেন বাছুরের ঠান্ডা না লাগে।
- ❖ অতপর জীবাণুমুক্ত কাঁচি দিয়ে নাভীর রজ্জু কেটে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে।

বাছুরের খাদ্য ঃ বাছুরের প্রাথমিক খাদ্য হলো কলস্ট্রাম বা কাচলা দুধ। জন্মের পর থেকে অন্তত ৩ দিন পর্যন্ত বাছুর যাতে দৈনিক ২ থেকে ২.৫ লিটার পরিমান কলস্ট্রাম খেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।বাছুরকে গাভীর দুধ সংগ্রহ করে খাওয়াতে হলে কিছু নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। যেমন:-

- ❖ দুধ সংগ্রহ করার পরপরই বাছুরকে খাওয়াতে হবে।
- ❖ পরে খাওয়াতে চাইলে শরীরের তাপমাত্রার সাথে সংগতি রেখে দুধ গরম করে খাওয়াতে হবে।
- ❖ ৭ দিন বয়স পর্যন্ত দৈনিক ৩ থেকে ৪ বার এবং এরপর দৈনিক দু'বার খাওয়াতে হবে। এছাড়াও বাছুরকে ননীবিহীন দুধ, শুষ্ক ননীবিহীন দুধ, ছানার পানি ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে।

সাধারণত দু'সপ্তাহ বয়স থেকে বাছুরকে "কাফ স্টারটার" প্রদান করা যেতে পারে। জন্মের ১৫-৭ দিনের মধ্যে বাছুরকে দানাদার মিশ্রণ খাওয়ানো শুরু করা যেতে পারে। ৩ থেকে ৬ মাস বয়সে বাছুরকে অল্প অল্প করে সাইলেজ খাওয়ানো যায়। দুধ ছাড়ার পর বাছুরকে কচি ঘাস খাওয়ানো যায়। বাছুরকে চারণভূমিতে চরে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাছুর যেন সবসময় পরিষ্কার পানি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাছুরের খাদ্যে যেন প্রয়োজনমত খাবার লবণ, খনিজ পদার্থ থাকে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে বাছুরের খাবারের সাথে খনিজ মিশ্রণ সরবরাহ করা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অ্যান্টিবায়োটিক বাছুরের বৃদ্ধিতে ভালো ভূমিকা রাখে। সুতরাং বাছুরের খাবারের সাথে পরিমানমত অ্যান্টিবায়োটিক সরবরাহ করা যেতে পারে।

বাছুরের বাসস্থান ঃ

- ❖ বাছুরের ঘর গাভীর ঘরের কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ❖ প্রতিটি বাছুরের জন্য ১০ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।
- ❖ বাছুরের ঘরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি খোলা জায়গা থাকতে হবে যেখানে বাছুর দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে।
- ❖ বাছুরের ঘর সংলগ্ন একটি খাবার ঘরও থাকতে হবে।
- ❖ বাছুরের ঘরে পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ❖ সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য যদি সম্ভব হয় বিভিন্ন বয়সের বাছুর যেমন: ৩ মাসের কম বয়স্ক বাছুর, ৩-৬ মাস বয়সী বাছুর এবং ৬ মাসের বেশি বয়স্ক বাছুর আলাদা আলাদা রাখা যেতে পারে।

বাছুরের পরিচর্যা

চালের গুঁড়া ৩০০ গ্রাম; গমের ভুসি ৩০০ গ্রাম; খৈল ২৫০ গ্রাম; চিটাগুড় ১৫০ গ্রাম; লবণ ও ভিটামিন ৫০ গ্রাম। এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে খড়, কাঁচাঘাস ও বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানি খাওয়াতে হবে। ছয় মাস বয়সে বাছুরকে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। বাছুরকে কৃমির ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ মতে দিতে হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সুষম খাদ্য দিতে হবে।

গাভীর রোগব্যাধি ও প্রতিকার

ওলান পাকা রোগ - নানা প্রকার রোগ-জীবাণু বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়।

লক্ষন - ক) ওলান লাল হয়ে ওঠে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভব হয়। খ) ব্যাথার দরুণ গাভী ওলানে হাত দিতে দেয় না এবং দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। গ) হলুদ বর্ণ দুধের সাথে ছানার মতো টুকরা বের হয়। (ঘ) পুরনো রোগে দুধ কমে যায় এমনকি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ওলান শক্ত হয়ে যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার - প্রথমত আক্রান্ত পশুকে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। ওলানে জমে থাকা দুধ বের করে দিতে হবে। ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

পেট ফাঁপা - সাধারণত গরহজমের জন্য গাভীর পেট ফেঁপে যায়। এছাড়া কিছু কিছু রোগের কারণেও পেট ফাঁপে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার - দানাদার খাদ্য বন্ধ করে দিতে হবে। শুধুমাত্র শুকনা খড় খেতে দেওয়া যেতে পারে। দ্রুত ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা - অনেক রোগের দরুন পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। তবে অন্ত্রের রোগ এদের মধ্যে অন্যতম। আক্রান্ত পশু দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার- দ্রুত ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। গরুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে। বাসি পচা খাবার দেয়া যাবে না।

নিউমোনিয়া - ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঠান্ডা ইত্যাদির কারণে পশুর নিউমোনিয়া হতে পারে।

লক্ষণ- ক) ঘনঘন নিঃশ্বাস এ রোগের প্রধান লক্ষণ। খ) রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাসকষ্ট হয়। গ) শুষ্ক কাশি হতে পারে। ঘ) উগ্র রোগে জ্বর হয় এবং নাক দিয়ে সর্দি পড়ে। ঙ) বুকের মধ্যে গরগর শব্দ হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার - দ্রুত ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

কৃমি - কৃমি নানা জাতের ও নানা আকারের হয়ে থাকে। কৃমিতে আক্রান্ত পশুকে ঠিক মতো খাবার দিলেও তার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় না। বরং দি দিন রোগা হতে থাকে।

লক্ষণ - ক) পশু দুর্বল হয়ে যায়। খ) খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেয়। গ) হাভিসার হয়ে যায়। ঘ) সময় সময় পায়খানা পাতলা হয়। ঙ) শরীরের ওজন কমে যায়। ছ) দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়। চ) রক্তশুণ্যতায় ভোগে বলে সহজেই অন্যান্য আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে।। জ) দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি পায় না।। ঝ) ফলে পশুকে রোগা ও আকারে ছোট দেখায়

চিকিৎসা ও প্রতিকার - গোবর পরীক্ষান্তে ভেটেরিনারি ডাক্তার পরামর্শ মত কৃমিনাশক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে।

মিল্ক ফিভার- গাভী বাচ্চা দেয়ার কয়েকদিন আগ থেকে কয়েকদিন পর পর্যন্ত শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির জন্য এই রোগ হয়।

লক্ষণ- প্রাথমিক অবস্থায়- ক) আক্রান্ত পশু কিছু খেতে চায় না। খ) হাটতে চায় না। গ) জিহবা বের হয়ে থাকে। ঘ) মাথা ও পায়ের মাংসপেশী কাপতে থাকে।

পরবর্তী অবস্থায় আক্রান্ত গাভী - ক) বুকে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে। খ) মাথা বাঁকিয়ে এক পাশে কাধের ওপর ফেলে রাখে। গ) এ অবস্থায় গাভী অনেকটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। ঘ) গাভী কাত হয়ে শুয়ে পড়ে, উঠতে পারে না। ঙ) ধমনীর মাত্রা বেড়ে যায়। চ) অবশেষে গাভী মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার ঃ দ্রুত ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

ফুল আটকে যাওয়া-বাচ্চা প্রসবের পর অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফুল বের হয়ে আসে না। এবং এসব ক্ষেত্রে গর্ভ ফুলের অংশ বিশেষ বাইরের দিক হতে ঝুলে থাকতে দেখা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার- আনাড়ি লোক দিয়ে টেনে হিচড়ে ফুল বের না করে ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

জলুবায়ুর প্রদাহ-অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের জীবাণু যোনিপথ হতে জরায়ুতে পৌছে এ রোগ হতে পারে। গর্ভ ফুলের টুকরা ভেতরে থেকে গেলে পচে যায় এবং প্রদাহের কারণ ঘটায়। কামপর্বে পশুর যৌন-ক্রিয়ার সময়ও অনেক সময় জরায়ুতে রোগ জীবানু সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ- ক) জ্বর হয়। খ) দুর্গন্ধযুক্ত জলের মতো কিংবা কালচে লাল রঙের স্রাব পড়তে দেখা যায়। গ) খাদ্যে অরুচি হয়। ঘ) দুধ কমে যায়। ঙ) গাভী পাল রাখে না।

চিকিৎসা ও প্রতিকার - ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

গর্ভপাত- সাধারণত রোগ-জীবানুর কারণেই অধিকাংশ গর্ভপাত হয়ে থাকে। এছাড়া আঘাত, বিষক্রিয়া, পক্ষাঘাত ইত্যাদি কারণেও গর্ভপাত হতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার - ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

ককসিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় - রক্ত মিশানো পাতলা পায়খানা, রক্ত শূণ্যতা ও শরীরের দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্তি এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণ - ক) শরীরের তাপমাত্রা অল্প বৃদ্ধি পায়। খ) হঠাৎ করে পায়খানা শুরু হয়। গ) পায়খানার সময় ঘন ঘন কোথ দেয়। ঘ) পায়খানা খুবই দুগর্ন্ধযুক্ত। ঙ) আক্রান্ত পশু দিন দিন দুর্বল হতে থাকে। চ) মলের সাথে মিউকাস অথবা চাকা চাকা রক্ত থাকে। ছ) খেতে চায় না জ) শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়

চিকিৎসা ও প্রতিকার - ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

বেবিসিয়াসিস বা রক্ত প্রস্রাব- আটালি দ্বারা এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ- ক) হঠাৎ জ্বর (১০৮ ডিগ্রী ফা.) হয়। খ) জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়। গ) রক্তের সঙ্গে লোহিত কণিকা ভাঙ্গা হিমোবোবিন যুক্ত হবে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে আসে।। ঘ) প্রস্রাবের রঙ লাল হয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা- ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

উকুন/আটালি - এরা এক প্রকার বহিঃ পরজীবী। অধিকাংশ গবাদি পশু উকুন/ আটালি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার - ভেটেরিনারি ডাক্তারের ব্যবস্থামতে পরজীবিনাশক দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে।

অধিবেশন-৮ রোগ প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা

রোগ প্রতিরোধ

- ❖ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পশুর গা ধোয়াতে হবে;
- ❖ গো-শালা ও পার্শ্ববর্তী স্থান সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে;
- ❖ নিয়মিতভাবে গরুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে;
- ❖ বাসস্থান সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে।
- ❖ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিমিত পরিমাণে পানি ও সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- ❖ রোগাক্রান্ত পশুকে অবশ্যই পৃথক করে রাখতে হবে।
- ❖ খাবার পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❖ খামারের সার্বিক জৈব নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।
- ❖ পশু জটিল রোগে আক্রান্ত হলে উপজেলা প্রাণি হাসপাতালের ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

গরুর ভ্যাকসিন বা টিকা (Vaccines)

অধিকাংশ গরু ছোঁয়াচে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগসমূহ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রয়োগ করতে হয়। আক্রান্ত গরুকে টিকা প্রদান করে কোন সুফল পাওয়া যায় না। সুতরাং গরুকে ছোঁয়াচে রোগমুক্ত রাখার জন্য আক্রান্ত হবার আগেই নিয়মত টিকা প্রয়োগ করতে হয়। গরুর রোগ প্রতিরাওধের জন্য নানা প্রকার টিকা আছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হল-

গরুর বিভিন্ন ধরণের টিকার নাম ও ব্যবহার

টিকার নাম	ব্যবহার
ক্ষুরা রোগের টিকা বা F M D Vaccine	বছুরকে ২ মাস বয়সে প্রথম ডোজ ১ মাস পরে বুস্টার ডোজ এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর ১ বার করে এই টিকা দিতে হয়। পরিমানঃ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক।
র‍্যাবিস ভ্যাকসিন (Rabies Vaccine)	বাছুরকে ২ মাস বয়সে প্রথম ডোজ ১ মাস পরে বুস্টার ডোজ এবং বছরে ১ বার করে এই টিকা দিতে হয়। পরিমানঃ প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক।
তড়কা রোগের টিকা (Anthrax Vaccine)	বাছুরকে ৪ মাস বয়সে প্রথম ডোজ এবং বছরে ১ বার করে চামড়ার নীচেএই টিকা দিতে হয়। পরিমান- ১সিসি।
বাদলা টিকা (BQ Vaccine)	বাছুরকে ৩ মাস বয়সে প্রথম ডোজ ১ মাস পরে বুস্টার ডোজ এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর ১ বার করে এই টিকা দিতে হয়। পরিমানঃ ৫ সিসি পরিমান গলার চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।
গলা ফুলার টিকা (HS Vaccine)	গলা ফুলা রোগের প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাছুরকে ৪ মাস বয়সে প্রথম ডোজ এবং বছরে ১ বার করে এই টিকা দিতে হয়। পরিমানঃ ২ সিসি চামড়ার নীচে দিতে হয়।
রোটা ভাইরাস টিকা (Trivacton-6)	বাচ্চা জন্মের ১মাস পূর্বে প্রথমবার এবং ৩-৪ দিন পূর্বে মা গাভীকে এই টিকা দিলে বাছুরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। পরিমানঃ ৫ সিসি চামড়ার নীচে দিতে হয়।

জীব-নিরাপত্তাঃ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কাঙ্খিত জীবে অনাকাঙ্খিত জীবানুর সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়, জীব-নিরাপত্তা বলতে সেই সকল কার্যক্রম গ্রহণকে বুঝায়। গরুর খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে

যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলোঃ

- ❖ গরুর সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে। বাসস্থান শুকনো এবং আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে তৈরী করতে হবে।
- ❖ গরুর খামার বন্য প্রাণি বা অন্যান্য আক্রমনকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- ❖ খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে।
- ❖ খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❖ খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।
- ❖ সঠিক সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।
- ❖ রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গরুকে কোয়ারেনটাইন কক্ষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ কোন গরুর মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ নতুন গরুর খামারে সংযোজন করার ক্ষেত্রে ইহাকে কোয়ারেনটাইন করে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করে অন্য ভেড়ার সাথে মিশতে দিতে হবে।

কবুতর ও কোয়েল পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ কবুতর ও কোয়েল পালনের গুরুত্ব

ক্ষুদ্র খামারে কবুতর পালনের গুরুত্ব

- ❖ সাধারণত একটি ভাল জাতের কবুতর বছরে ১২ জোড়া ডিম প্রদানে সক্ষম। এই ডিম গুলোর প্রায় প্রতিটি থেকেই বাচ্চা পাওয়া যায়। এই বাচ্চা পরর্বতী ৪ সপ্তাহরে মধ্যেই খাওয়া বা বিক্রির উপযোগী হয়। অনেকে কবুতরের বাচ্চা রোগীর পথ্য হিসেবে বেছে নেন।
- ❖ গৃহপালিত অন্যান্য পাখির মত কবুতরকে পোষ মানানো বা লালন করা যায়।
- ❖ খুব অল্প জায়গায় কবুতর লালন পালন করা যায়।
- ❖ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবুতর নিজের খাবার নিজেই খুঁজে নিয়ে থাকে। তাই কবুতরের খাবারের জন্য বাড়তি যত্ন বা খরচ খুব একটা হয় না।
- ❖ বাড়ির আঙিনা বা ছাদের ওপর কাঠের ঘর তৈরি করে অনায়াসেই কবুতর পালন করা যায়।
- ❖ প্রমান সাইজের ঝুড়িতেও কবুতর পালন করা যায়।
- ❖ কবুতরের ডিম থেকে মাত্র ১৮ দিনে সাধারণ নিয়মে বাচ্চা ফুটে থাকে। এই বাচ্চা আবার পরর্বতী ৫ থেকে ৬ মাস পরে ডিম প্রদান শুরু করে।
- ❖ কবুতরের মাংসের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কারণ, কবুতরের মাংস খুবই সুস্বাদু ও বলকারক।
- ❖ একটি খুব ভালো প্রজাতির কবুতর লালন করলে পরর্বতী ১ বছরের মধ্যে ১ জোড়া থেকে কয়েক জোড়া কবুতর পাওয়া যায়।
- ❖ কবুতরের রোগ ব্যাধি কম হয়।
- ❖ কবুতরের ক্ষেত্রে ডিম ফোটার হার ৯৮%, যা মুরগির ক্ষেত্রে প্রায়শ ৮০-৮৫% হয়ে থাকে।
- ❖ এদের ডিম ফোটানোর জন্য ইনকিউবেটর বা এজাতীয় কোনো ব্যয়বহুল যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।
- ❖ স্বল্প বয়সে এদের পুনরুৎপাদন শুরু হয়। তাই একজন উৎপাদনকারী অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হতে পারে।

ক্ষুদ্র খামারে কোয়েল পালনের গুরুত্ব

- ❖ কোয়েল পালন করার জন্য অতিরিক্ত বা বাহুল্য কোন খরচ হয় না।
- ❖ কোয়েলকে সহজেই পোষ মানানো যায়।
- ❖ বাড়ির যেকোন কোণ বা আঙিনা অথবা বাড়ির ছাদ ইত্যাদি জায়গাতেও কোয়েল পালন করা যায়।
- ❖ গৃহপালিত পাখির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এই পাখির আয়তন খুব বেশি নয়।
- ❖ বিজ্ঞদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের জন্য সর্বাধিক উপযোগী।
- ❖ কোয়েলের মাংস ও ডিম খুবই সুস্বাদু।
- ❖ কোয়েলের একটি ক্ষুদ্র ডিমে যে পরিমান প্রোটিন রয়েছে একটি বড় আকারের মুরগির ডিমেও প্রায় সেই পরিমান প্রোটিন বিদ্যমান।
- ❖ ঢাকা শহরের বঙ্গবাজার এ-াকার পোল্ট্রি মার্কেটে কোয়েলের ডিম, বাচ্চা এবং পরিণত বয়সের কোয়েল কিনতে পাওয়া যায়। এখান থেকে এগুলো সংগ্রহ করে ভাড়া বাসায় স্বল্প পরিসরেও কোয়েল পালন করা সম্ভব।
- ❖ সাধারণত একটি ভাল জাতের কোয়েল বছরে ২৫০ থেকে ৩০০টি ডিম প্রদানে সক্ষম হয়ে থাকে। এই ডিমগুলোর প্রায় প্রতিটি থেকেই বাচ্চা পাওয়া যায়। এই বাচ্চা পরবর্তীর ৬ থেকে ৭ সপ্তাহের মধ্যেই খাওয়া বা বিক্রির উপযোগী হয়। পাশাপাশি এই বয়সে তারা ডিম দেয়া শুরু করতে পারে।
- ❖ অত্যন্ত কম পুঁজি নিয়ে কোয়েলের খামার তৈরি করা যায়।
- ❖ কোয়েলের আকার ক্ষুদ্র বলে এদের লালন পালনের জন্য বিস্তৃত জায়গা প্রয়োজন হয় না। ছোট আকারের একটি খাচাতেই কোয়েল পালন করা যায়। একটি প্রমান সাইজের মুরগির জন্য যে পরিমান জায়গা প্রয়োজন হয়। সেই একই জায়গা কমপক্ষে ১২টি কোয়েল পালন করা যায়।
- ❖ কোয়েলের রোগ ব্যাধি প্রায় হয় না বললেই চলে। যেহেতু কোয়েলের রোগ ব্যাধি কম হয় সুতরাং এদের জন্য বাড়তি চিকিৎসা ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন হয় না।
- ❖ খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একটি বাচ্চা কোয়েল ডিম দিয়ে থাকে। সাধারণত ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ বয়সেই একটি কোয়েল ডিম প্রদান করে থাকে।
- ❖ কোয়েলের জন্য বিশেষ কোন খাবার সরবরাহ করতে হয় না। এদের খাদ্য চাহিদা কম অথচ, শারীরিক বাড় খুব বেশি। এরা খুব দ্রুত বাড়তে পারে। দিনে ২০ থেকে ৩০ গ্রাম খাবার দিলেই এরা এদের শারীরিক ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে।
- ❖ কোয়েলের ডিম থেকে সর্বোচ্চ ২০ দিনের মধ্যেই বাচ্চা ফুটে বের হয়। এই বাচ্চা পরিণত কোয়েলে রূপান্তরিত হতে সময় লাগে ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ।

কোয়েলের মাংসে চর্বির পরিমান খুব কম বলে যে কোন রোগীর পথ্য হিসেবে কোয়েলের মাংস ব্যবহৃত হতে পারে। কোয়েলের ডিম পর্যাপ্ত পুষ্টির চাহিদাও মেটাতে পারে। এই কারনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন অত্যন্ত লাভজান পদ্ধতি।

কবুতরের এবং কোয়েলের জাত বা বংশ

বহুবিচিত্র ধরনের নানা জাতের কবুতর রয়েছে। আমাদের দেশে ২০ টিরও অধিক জাতের কবুতর আছে বলে জানা যায়। নিম্নে প্রধান কয়েকটি জাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। পোলা (দেশি কবুতর):
এই জাতের কবুতরের উৎপত্তিস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ। আমাদের দেশে এ জাতের কবুতর প্রচুর দেখা যায় এবং মাংসের জন্য এটার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। ঘরের আশেপাশে খোপ নির্মাণ করলে এরা আপনা আপনি এখানে এসে বসবাস করে। এদের বর্ণ বিভিন্ন সেডযুক্ত ধূসর রংয়ের। এদের চোখের আইরিস গাঢ় লাল বর্ণের এবং পায়ের রং লাল বর্ণের হয়।

২। হোমার:
উড়াল প্রতিযোগিতায় ব্যবহার হয় বলে রেসার হোমার বলা হয়। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বহু দেশে রেসিং ক্লাব রয়েছে। বর্তমানে রেসিং ফলাফল নির্ধারিত হয় ইলেকট্রনিক টাকিং সিস্টেম (ইটিএস) মেশিন দিয়ে।

৩। টাম্বলার
এসব জাতের কবুতর আকাশে ডিগবাজী খায় বলে এদের টাম্বলার বলে। আমাদের দশে এই জাতটি গিরিবাজ নামে পরিচিত। এদের উৎপত্তিস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ। মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের দেশে এদের যথেষ্ট কদর রয়েছে।

৪। লোটন
লোটন কবুতরকে রোলিং কবুতরও বলা হয়। গিরিবাজ কবুতর যেমন শূন্যের উপর ডিগবাজী খায়, তেমন লোটন কবুতর মাটির উপর ডিগবাজী খায়। সাদা বর্ণের এই কবুতরের চোখ গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের
এবং পা লোমযুক্ত।

৫। লাহোরী
আমাদের দেশে এই কবুতরটি শিরাজী কবুতর হিসেবে পরিচিত। এদের চোখের চারদিক, গলার সম্মুখভাগ, বুক, পেট, নিতম্ব, পা ও লেজের পালক সম্পূর্ণ সাদা হয় এবং মাথা, গলার পিছন দিক এবং পাখা রঙীন হয়। সাধারণত কালো, লাল, হলুদ, নীল ও রূপালী ইত্যাদি বর্ণের কবুতর দেখা যায়।

৬। কিং
কিং জাতের কবুতরের মধ্যে হোয়াইট কিং এবং সিলভার কিং বিশেষ জনপ্রিয়ত। এছাড়াও রয়েছে বড রেড এবং ইয়েলো কিং। এই জাতের কবুতর মূলত প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হয়।

৭। ফ্যানটেল
এটি অতি প্রাচীন জাতের কবুতর। এ জাতের কবুতর লেজের পালক পাখার মত মেলে দিতে পারে বলে এদেরকে ফ্যানটেল বলা হয়। এদের রং মূলত সাদা তবে কালো, নীল ও হলুদ বর্ণের ফ্যানটেল সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে। পা পালক দ্বারা আবৃত থাকে। এ জাতের কবুতর প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হয়।

৮। জ্যাকোবিন
এই কবুতরের মাথার পালক ঘাড় অবধি ছড়ানো থাকে। এদের আদি জন্মস্থান ভারত বলেই ধারণা করা হয়। এই কবুতর সাধারণত সাদা, লাল, হলুদ, নীল ও রূপালী বর্ণের হয়। এদের দেহ বেশ লম্বাটে। চোখ মুক্তার মত সাদা হয়।

কোয়েলের জাত বা বংশ : কোয়েলের জাত হিসেবে প্রথমেই উলেখ করতে হয় জাপানি কোয়েলকে। কারণ, জাপানেই কোয়েলকে সর্বপ্রথম গৃহপালিত করা হয়েছে। জাপানের হিসেবে অনুযায়ী কোয়েলের কয়েকটি জাত এবং উপজাত রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ-

লেয়ার কোয়েলঃ মুরগির মতো কোয়েলের মধ্যেও লেয়ার জাত বিদ্যমান। এই জাতের উলেখযোগ্য গোষ্টি হলো-ফারাও, ইংলিশ হোয়াইট, ম্যানচিরিয়াল গোল্ডেন, ব্রিটিশ অরেঞ্জ ইত্যাদি। এই জাতের কোয়েলকে শুধু ডিম প্রদানের জন্য পালন করা হয়ে থাকে।

ব্রয়লার কোয়েলঃ মুরগির মতো কোয়েলের মধ্যে ব্রয়লার জাত বিদ্যমান এই জাতের উলেখযোগ্য গোষ্টি হলো আমেরিকান বব হোয়াইট কোয়েলে ইন্ডিয়ান হোয়াইট ব্রেস্টেড কোয়েল ইত্যাদি। এই জাতের কায়েলকে শুধু মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে।

অধিবেশন-৩ কবুতর ও কোয়েলের বাসস্থান এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামে টিন বা খড়ের চালা ঘরের কার্ণিশে মাটির হাড়ি অথবা টিন বেঁধে রেখে কবুতর পালনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া কাঠের তৈরি ছোট ছোট খোপ তৈরি করেও কবুতর পালা হয়ে থাকে। অল্প-পরিসরে যা বাণিজ্যিকভিত্তিতে কবুতর পালনের জন্য অবশ্যই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

নিম্নে কবুতরের ঘর বা খোপ তৈরির বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করা হলো।

স্থান নির্বাচন ঃ কবুতরের খামারের জন্য উঁচু ও শুষ্ক সমতল ভূমি থাকা প্রয়োজন।

ঘরের উচ্চতা ঃ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, বেজী ইত্যাদি যেন কবুতরের ঘর নাগালে না পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ঘর উঁচু করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে কাঠ বা বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার উপর ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে।

ঘরের পরিসরঃ প্রতি এক জোড়া কবুতরের জন্য একটি ঘর থাকা প্রয়োজন। এক জোড়া কবুতর যাতে ঘরের ভিতর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরতে ফিরতে পারে তা লক্ষ্য রেখে ঘর নির্মাণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা ঃ কবুতরের ঘর বা খোপ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন সেখানে পোকা-মাকড়, কৃমি, জীবাণু ইত্যাদির উপদ্রব কম থাকে এবং ঘর সহজেই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়।

সূর্যালোক ঃ ঘরে যাতে সূর্যের পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ সূর্যের আলো যেমন পাখির দেহে ভিটামিন-ডি সৃষ্টিতে সাহায্যে করে তেমনি পরিবেশও জীবাণুমুক্ত রাখে।

বায়ু চলাচল ঃ কবুতরের ঘরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ দূষিত বাতাস বা পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাবে পাখির স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

কোয়েলের থাকার জায়গা বা বাসস্থান ঃ লিটার বা খাঁচায় কোয়েল পালন করা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। মোটামুটিভাবে ১৩০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, ৬০ থেকে ১০০ সিন্টিমিটার প্রস্থ এবং ২৫ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি খাচায় কমপক্ষে ৬০ থেকে ১০০টি কোয়েল পালন করা যায়। বাচ্চা রাখার খাচাসহ পরিনত বয়সের কোয়েলের খাঁচাগুলোতে যেন ইদুর, ছুচো ইত্যাদি না ঢুকতে পারে-সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাঁচার ফাঁক তৈরি করতে হবে। কোয়েলের জন্য খাবার এবং পানির সুব্যবস্থা তার খাঁচাতেই রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে-বৃষ্টির পানি বা অন্য কোন তরলপদার্থ দ্বারা কোয়েলের খাঁচা ভিজে না যায়। ভেজা ছান কোয়েলের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

কোয়েলের বাচ্চাকে ১৪ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত কৃত্রিম উত্তাপের মাধ্যমে ব্রুডিং এর ব্যবস্থা করতে হয়। মুরগির বাচ্চার মতো একই পদ্ধতিতে কোয়েলের বাচ্চাকে ব্রুডিং করতে হয়। তবে হিসেব করে দেখা গেছে ১০০টি মুরগির বাসস্থানের জায়গায় কমপক্ষে ১০০০ থেকে ১২০০ কোয়েল পালন করা সম্ভব।

কবুতরের খাদ্য ঃ কবুতর তার দেহের প্রয়োজন এবং আকার অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি কবুতর দৈনিক প্রায় ৫০-৩০ গ্রাম পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করে থাকে। কবুতর প্রধানত গম, মটর, খেশারী, ভুট্টা, সরিষা, যব, চাল, ধান, কলাই ইত্যাদি শস্যদানা খেয়ে থাকে। মুক্ত অবস্থায় পালিত কবুতরের জন্য সকাল-বিকাল মাথা পিছু আধ মুঠ শস্যদানা নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে দিলে প্রয়োজন মত তারা খেতে পারবে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে কবুতর উৎপাদনের জন্য নিম্নে প্রদত্ত খাদ্য মিশ্রণ ব্যবহার করা উত্তম।

কবুতরের খাদ্য তালিকা		কোয়েলের খাদ্য বা খাবার ব্যবস্থা
খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	সাধারণভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বয়সের কোয়েল দিনে ২০ থেকে ২৫ গ্রাম পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করতে পারে।
ভুট্টা	৩৫	এদের খাদ্যে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ আমিষ এবং ২৫০০ থেকে ৩০০০ কিলোক্যালোরি বিপাকীয় শক্তি বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে হাস মুরগির যে খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে তার মধ্যেই এই ধরনের আমিষ এবং ক্যালোরি বিদ্যমান। সুতরাং হাস মুরগির খাবার প্রদান করে কোয়েল পালন করা যায়।
মটর	২০	
গম	৩০	
ঝিনুকের গুঁড়া/চুনাপাথর চূর্ণ/অস্থিচূর্ণ	০৭	
ভিটামিন/এমাইনো এসিড প্রিমিক্স	০৭	কোয়েল খুব ঘন ঘন পানি পান করে। তাই কোয়েলের খাচায় কয়েকটি স্থানে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পানির পাত্রগুলো যেন খাঁচার সাথে শক্ত করে আটকানো থাকে। যাতে পানির পাত্র উপচে বা উল্টে পড়ে কোয়েলের গা ভিজে না যায়।
লবণ	০১	
মোট	= ১০০	

এই সাথে কবুতরের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। এক পাত্রে কবুতরের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার ও অন্য পাত্রে প্রয়োজন মত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানি রাখতে হবে।

অধিবেশন-৪ কবুতর ও কোয়েলের গুরুত্বপূর্ণ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

কবুতরের গুরুত্বপূর্ণ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	চিকিৎসা	প্রতিরোধ
সালমেনেলোসিস / প্যারাটাইফোসিস	সালমোনেলা টাইফিমুরিয়াম	আঠালো শেষ্মা, ফেনা ও দুর্গন্ধযুক্ত ডায়রিয়া। ক্রমাগত কৃশতা। ভারসাম্য হীনতা ও পক্ষাঘাত।	সেনসিটিভিটি টেস্ট করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। সাথে ভিটামিন ও মিনারেল খাওয়াতে হবে।	১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। ২। টিকা প্রদান করতে হবে।
পাসটিউরেলোসিস	পাসটিউরেলা মালটোসিডা	ডাইরিয়া, জ্বর। কোন লক্ষণ ব্যতীত ৪৮-২৪ ঘন্টা মধ্যে কবুতর মারা যায়	সেনসিটিভিটি টেস্ট করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এই সাথে ভিটামিনও মিনারেল খাওয়াতে হবে।	১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। ২। টিকা প্রদান করতে হবে।
করাইজা অথবা আউলস হেড	হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা	সর্দি, চোখের পাতাদ্বয় ফুলে প্যাঁচার মাথার ন্যায় দেখায়, অক্ষিঝিল্লি প্রদাহের ফলে চোখ দিয়ে muco-purulent পদার্থ নির্গত হয়।	সেনসিটিভিটি টেস্ট করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এই সাথে ভিটামিনস ও মিনারেলস খাওয়াতে হবে।	১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। ২। টিকা প্রদান করতে হবে।
মাইকোপাজমোসিস	মাইকোপাজমা কলাম্বিনাম	সর্দি, চোখ ও নাক দিয়ে প্রথমে পানি এবং পড়ে muco-purulent পদার্থ নির্গত হয়। মুখ ও কণ্ঠে অত্যধিক প্রদাহ, দুর্গন্ধ সৃষ্টি ও শ্বাসকষ্ট।	এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।	১। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। ২। টিকা প্রদান করতে হবে।
নিউক্যাসল ডিজিজ	প্যারামিক্সো ভাইরাস টাইপ১-	সবুজ রংয়ের ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্ট, মুখ হাঁ করে শ্বাস গ্রহণ। ভারসাম্যহীনতা, মাথা ঘোরা, পাখা ও পায়ের পক্ষাঘাত ইত্যাদি।	এন্টিবায়োটিক, এমাইনো এসিড, ভিটামিন, ইমিউনো স্টিমুলেটর	* জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। * টিকা প্রদান করতে হবে।
ভিফথেরো স্কল পক্স (বসন্ত রোগ)	বোরেলিয়া কলাম্বরী ভাইরাস	পালকহীন ত্বক বিশেষ করে চোখ, ঠোঁটের চারপাশে এবং পায়ে ক্ষত বা পক্স দেখা যায়	এন্টিবায়োটিক, এমাইনো এসিড, ভিটামিন এ এবং সি, ইমিউনো স্টিমুলেটর, টপিক্যাল আইওডিন	* জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
পরজীবী রোগ	আইমেরিয়া, এসকারিস, ক্যাপিলারিয়া, ট্রাইকোমোনা	দুর্বলতা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা, শুকিয়ে যাওয়া, ডাইরিয়া, পুষ্টিহীনতা ও অবশেষে মৃত্যু।	কৃমিনাশক, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স, এমাইনো এসিড	* জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

কোয়েলের স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপনা ও রোগ বালাই ঃ কোয়েলের রোগ ব্যাধি খুব কম হয়। কোয়েল অসুস্থ হলে সাথে সাথে তাকে সুস্থ কোয়েল থেকে সরিয়ে নিতে হবে এবং ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। খাঁচায় কোন কোয়েল মারা গেলে সাথে সাথে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। মরা কোয়েল পুড়িয়ে বা পুতে ফেলতে হবে।

কোয়েলের রোগ ব্যাধির মধ্যে আমাশয় উলেখ্যযোগ্য। এই রোগ হলে কোয়েলের ঘন ঘন পায়খানা হয়, খুখামন্দা দেখা দেয় পাশাপাশি কোয়েলের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খাওয়াতে হবে।

সাধারণত কোনো ভ্যাকসিন অথবা কৃমিনাশক ঔষধ দেয়া হয় না। তবে বাচ্চা ফুটার প্রথম ২ সপ্তাহ সতর্কতার সাথে কোয়েলের বাচ্চার যত্ন নিতে হয়।

ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে বাচ্চা কোয়েলের মৃত্যু হতে পারে, যদি না ব্রুডারে থাকাকালীন তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখা যায়। তাই ব্রুডিং করার সময় অর্থাৎ প্রথম দুই সপ্তাহ বাচ্চা কোয়েলকে নজরে রাখতে হবে। কারণ ঐ সময় অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস নামক ছত্রাকের প্রভাবে এই ব্রুডার নিউমোনিয়া হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ বাচ্চাপাখী ঝিমিয়ে পড়ে, দুর্বল হয়ে পড়ে খাওয়া দাওয়াবন্ধ হয়ে যায়। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে। চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ থেকে রস বেরোতে থাকে। এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৩ - ২ ভাগ। কিন্তু আক্রান্তের হার শতকরা ৫০ ভাগ।

চিকিৎসা ঃ ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রোপিওনেট ১০০ কেজি খাবারের সাথে মেশাতে হবে। আন্টিবায়টিক খাওয়াতে হবে। পাশাপাশি উপজেলার ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

টার্কি পালন প্যাকেজ

অধিবেশন-১ টার্কি পালন

ক্ষুদ্র খামারে টার্কি পালনের উদ্দেশ্যঃ

- ❖ টার্কি (Turkey) মেলিয়াগ্রিডিডিই পরিবারের এক ধরনের বড় আকৃতির পাখি বিশেষ।
- ❖ এগুলো দেখতে মুরগির বাচ্চার মতো হলেও তুলনামূলকভাবে অনেক বড়।
- ❖ এরা পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। পালনের জন্য উন্নত অবকাঠামো দরকার হয় না।
- ❖ এরা প্রতিদিন মোট খাদ্যের ৫০-৬০ ভাগ নরম ঘাস খায়। তাই খাবার খরচ কম।
- ❖ রোগবালাই (বার্ড ফ্লু, গুটি বসন্ত, ঠান্ডাজনিত রোগ ছাড়া এখন পর্যন্ত এদের অন্য কোনো রোগ পরিলক্ষিত হয় না।
- ❖ মাংস উৎপাদনের দিক থেকে খুবই ভালো (৬ মাস বয়সে ৫-৬ কেজি)।
- ❖ পাখির মাংস হিসেবে এটা মজাদার এবং কম চর্বিযুক্ত। তাই গরু বা খাসির মাংসের বিকল্প হতে পারে।
- ❖ আমাদের দেশে অনেকের ব্রয়লার মুরগির মাংসের ওপর অনীহা আছে। তাদের জন্য এটা হতে পারে প্রিয় খাবার।
- ❖ প্রোটিনের নতুন আরেকটি উৎস হিসেবে টার্কি হতে পারে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত।
- ❖ টার্কি পাখি সে রকম একটি সহনশীল জাত, যে কোনো পরিবেশ দ্রুত এরা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।
- ❖ এরা বেশ নিরীহ ধরনের পাখি, মুক্ত অথবা খাঁচা উভয় পদ্ধতিতে পালন করা যায়।
- ❖ ৬-৭ মাস বয়স থেকে ডিম দেয়া শুরু করে এবং বছরে ২-৩ বার ১০-১২টি করে ডিম দেয়।
- ❖ একটি মেয়ে টার্কির ৫-৬ কেজি এবং পুরুষ টার্কি ৮-১০ কেজি ওজন হয়।
- ❖ ৪-৫ মাস বয়সের টার্কি ক্রয় করা ভালো, এতে ঝুঁকি কম। এক জোড়া টার্কির দাম হবে প্রায় ৪৫০০-৫০০০ টাকা।
- ❖ প্রথমে বাণিজ্যিকভাবে শুরু না করে ৮-১০ জোড়া দিয়ে শুরু করা ভালো, কারণ তাতে সুবিধা অসুবিধাগুলো নির্ণয় করা সহজ এদের মাংস উৎপাদন ক্ষমতা অনেক, টার্কি ব্রয়লার মুরগির থেকে দ্রুত বাড়ে;
- ❖ ঝামেলাহীনভাবে দেশি মুরগির মতো পালন করা যায়; অল্প পুঁজিতে একটি আদর্শ টার্কির খামার করা যায়;
- ❖ টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি ঘাস, লতা-পাতা খেতেও পছন্দ করে;
- ❖ টার্কি দেখতে সুন্দর, তাই বাড়ির শোভাবর্ধন করে;
- ❖ টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমান বেশি, চর্বি কম। তাই গরু কিংবা খাসির মাংসের বিকল্প হতে পারে;
- ❖ টার্কির মাংসে অধিক পরিমান জিংক, লৌহ, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন ই ও ফসফরাস থাকে।
- ❖ টার্কির মাংসে এমাইনো এসিড ও ট্রিপটোফেন অধিক পরিমাণে থাকায় এর মাংস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়;
- ❖ অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং কিছু নিয়ম মেনে চললে খামারে ঝুঁকি অনেক কমে যায়;
- ❖ উচ্চমূল্য থাকায় খরচের তুলনায় আয় অনেক বেশি।

টার্কির জাত

১। ব্রড ব্রেস্টেড হোয়াইট টার্কি **(Broad breasted white Turkey)**: ব্রড ব্রেস্টেড হোয়াইট টার্কি মাংসের জন্য বাণিজ্যিকভাবে পালন করা সর্বাধিক জনপ্রিয় টার্কির জাত। এদেরকে কৃত্তিম জাত উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ডেভেলপ করা হয়েছে। বানিজ্যিক ভাবে টার্কি পালনের জন্য এই জাতটি সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচিত। স্বাভাবিকভাবে এদের সাদা ও হালকা পালকের ভিতর হতে এদের ত্বক দেখা যায়। অন্যান্য যে কোন জাতের তুলনায় বেশি মাংসের যোগান দিয়ে থাকে। একদিন বয়সি বাচ্চার রঙ হলুদ। এ জাতের পূর্নবয়স্ক টার্কির গড় ওজন প্রায় ১৭ থেকে ২০ কেজি পর্যন্ত হয়। কখনও কখনও এদের ওজন আরো বেশি হতে পারে।

২। ব্ল্যাক টার্কি **(Black Turkey)**: কালো টার্কি স্পেনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেখানে এরা 'বাক স্প্যানিশ' নামে পরিচিত পায়। মধ্য ইউরোপে প্রাপ্ত বাক টার্কিগুলো আকারে ছোট এরা মাঝারি থেকে বড় আকারের পাখি। কালো টার্কি মাংসের জন্য বিখ্যাত। অন্যান্য পাখির তুলনায় এদের শরীরে চর্বির পরিমান কম এবং মাংসের পরিমান বেশী। অল্পবয়স্ক টার্কির পালকে সাদা বা ব্রোঞ্জের রঙ থাকে, কিন্তু বড় হওয়ার পরে এদের রঙে পরিবর্তিত হয়। এদের ডানা কালো এবং উজ্জ্বল লাল হতে পারে। এই পাখির চোখ কালো বাদামী রঙের হয়। পালক কালো হলেও কালো টার্কির চামড়া সাধারণত সাদা। প্রাপ্তবয়স্ক টার্কির শরীরের গড় ওজন প্রায়ই ১০.৫ কেজি এবং অল্প বয়স্ক টার্কির গড় ওজন প্রায় ৯.৫ কেজি।

৩। ব্লু স্লেট টার্কি **(Blue slate Turkey)**: নীল স্লেট টার্কিগুলি আসলে তিনটি রঙের পর্যায়ে আসে: পালকের কালো দাগযুক্ত নীল, শক্ত কালো এবং শক্ত নীল ধূসর। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় হালকা হতে থাকে। তাদের লাল থেকে নীল-সাদা ওয়াটেল, মাথা এবং গলা রয়েছে এবং তাদের শিং-রঙের চঞ্চু, বাদামী চোখ এবং কালো দাড়ি রয়েছে। নীল স্লেট টার্কিগুলি মাঝারি আকারের টার্কি। গড় ওজন: ১২-৮ কেজি

৪। বারবোন রেডস টার্কি **(Bourbon reds Turkey)**: Bourbon লাল টার্কি খুব সুন্দর চেহারা সঙ্গে বড় পাখি। এদের পালকগুলি গাড় কালো রঙের হয় এবং লেজে সাদা প্রাইমারিস থাকে যা একটি নরম লাল ব্যান্ড এবং সাদা উড়ন্ত পালক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। প্রজনন মান নির্দেশ করে যে পরিপক্ক বোরবন রেড টম - ১৫ কিলোগ্রাম, এবং পরিপক্ক হেন-৮.২ কিলোগ্রাম (১৮ পাউন্ড) ওজনের।

৫। আদর্শ ব্রোঞ্জ টার্কি **(Standard bronze Turkey)**: ব্রোঞ্জের জাতটি সুকৃজল এবং দৃষ্টিনন্দন। স্ট্যান্ডার্ড ব্রোঞ্জ টার্কি ব্রড ব্রেস্টেড জাতের এক তৃতীয়াংশ ছোট কিন্তু দীর্ঘজীবী এবং ধীর বর্ধনশীল। সম্প্রতি সময়ে দ্রুত বর্ধনশীল জাত উদ্ভাবনের ফলে এই জাতকে কম পছন্দ করা হয়।প্রাপ্তবয়স্ক টার্কির ওজন (১১-৯) কেজি।

অধিবেশন-৩ টার্কির পালন পদ্ধতি

পালন পদ্ধতি : দুইভাবে টার্কি পালন করা যায়- ০১. মুক্ত চারণ পালন পদ্ধতি ও ০২. নিবিড় পালন পদ্ধতি মুক্ত চারণ পালন পদ্ধতি

মুক্ত চারণ পদ্ধতিতে এক একর ঘেরা জমিতে ২৫০-২০০টি পূর্ণ বয়স্ক টার্কি পালন করা যায়। রাতে পাখিপ্রতি ৪-৩ বর্গফুট হারে জায়গা লাগে। চরে খাওয়ার সময় তাদের শিকারি জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ছায়া ও শীতল পরিবেশ জোগানর জন্য খামারে গাছ রোপণ করতে হবে। চারণভূমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হবে এতে পরজীবীর সংক্রমণ কম হয়।

সুবিধা : খাবারের খরচ ৫০ শতাংশ কম হয়; স্বল্প বিনিয়োগ : খরচের তুলনায় লাভের হার বেশি।

মুক্ত চারণ ব্যবস্থায় খাবার : টার্কি খুব ভালোভাবে আবর্জনা খুঁটে খায় বলে এরা কেঁচো, ছোট পোকামাকড়, শামুক, রান্নাঘরের বর্জ্য ও উঁইপোকা খেতে পারে, যাতে প্রচুর প্রোটিন আছে ও যা খাবারের খরচকে ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এছাড়া শিম জাতীয় পশুখাদ্য যেমন লুসার্ন, ডেসম্যান্থাস, স্টাইলো এসব খাওয়ানো যায়। চরে বেড়ানো পাখিদের পায়ের দুর্বলতা ও খোঁড়া হওয়া আটকাতে খাবারে ঝিনুকের খোলা মিশিয়ে সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম হিসাবে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। খাবারের খরচ কম করার জন্য শাকসবজির বর্জ্য অংশ দিয়ে খাবারের ১০ শতাংশ পরিমান পূরণ করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য রক্ষা : মুক্তচারণ ব্যবস্থায় পালিত টার্কির অভ্যন্তরীণ (গোল কৃমি) ও বাহ্য (ফাউল মাইট) পরজীবী সংক্রমণের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি থাকে। তাই পাখিদের ভালো বিকাশের জন্য মাসে একবার ডিওয়ার্মিং ও ডিপিং করা আবশ্যক।

নিবিড় পালন পদ্ধতি : বাসস্থান টার্কিদের রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া, শিকারি জীবজন্তু থেকে বাঁচায় ও আরাম জোগায়। অপেক্ষাকৃত গরম অঞ্চলগুলোতে খামার করলে ঘরগুলো লম্বালম্বি পূর্ব থেকে পশ্চিমে রাখতে হবে। খোলা ঘরের প্রস্থ ৯ মিটারের বেশি হওয়া চলবে না। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরের উচ্চতা ২.৬ থেকে ৩.৩ মিটারের মধ্যে থাকতে হবে। বৃষ্টির ছাঁট আটকাতে ঘরের চালা এক মিটার বাড়িয়ে রাখতে হবে। ঘরের মেঝে সস্তা, টেকসই, নিরাপদ ও আর্দ্রতারোধক বস্তু যেমন কংক্রিটের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কম বয়সি এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির ঘরের মধ্যে অন্তত ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে অন্তত ২০ মিটার দূরত্ব থাকতে হবে। ডিপ লিটার পদ্ধতিতে টার্কি পালনের সাধারণ পরিচালনা ব্যবস্থা মুরগি পালনেরই মতো, তবে বড় আকারের পাখিটির জন্য যথাযথ বসবাস, ওয়াটারার ও ফিডারের জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সুবিধা : উন্নত উৎপাদন দক্ষতা; উন্নততর পরিচালন ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ।

নিবিড় পালন ব্যবস্থায় খাদ্য : নিবিড় পালন ব্যবস্থায় টার্কি মুরগিকে ম্যাশ ও পেলেট (ট্যাবলেট) দুইভাবেই খাবার দিতে হবে। মুরগির তুলনায় টার্কির শক্তি, প্রোটিন ও খনিজের প্রয়োজন বেশি। সেজন্য টার্কির খাবারে এগুলোর আধিক্য থাকতে হবে। খাবার মাটিতে না দিয়ে ফিডারে দিতে হবে। যেহেতু পুরুষ ও মাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তির (এনার্জি) পরিমান আলাদা, তাই ভালো ফল পাওয়ার জন্য তাদের পৃথকভাবে পালন করতে হবে। টার্কিদের সব সময় অবিরাম পরিষ্কার পানির প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে ওয়াটারারের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং আপেক্ষতৃক ঠান্ডা সময়ে খাবার দিতে হবে। পায়ের দুর্বলতা এড়াতে দিনে ৪০-৩০ গ্রাম হারে ঝিনুকের খোসার গুঁড়া দিতে হবে এবং খাবারে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হলে তা আস্তে আস্তে করতে হবে।

সবুজ খাদ্য : নিবিড় পদ্ধতিতে ড্রাই ম্যাশ হিসাবে মোট খাদ্যের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সবুজ খাবার দেয়া যায়। সব বয়সের টার্কির জন্য টাটকা লুসার্ন প্রথম শ্রেণীর সবুজ খাদ্য। এছাড়া খাবারের খরচ কম করার জন্য ডেসম্যান্থাস ও স্টাইলো কুচি করে টার্কিদের খাওয়ান যেতে পারে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে টার্কি মুরগি পালন দিনে দিনে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। টার্কি বাণিজ্যিক মাংস উৎপাদনের জন্য খুবই উপযুক্ত কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে ডিম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা দেখতে খুব সুন্দর হয় এবং আপনার বাড়ির সৌন্দর্য বাড়াতে করতে সাহায্য করে। টার্কি মুরগি দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং ব্রয়লার মুরগির মতো খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অন্যান্য পরিস্থিতিতে টার্কি মুরগি পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত। এগুলোর পালন মুরগির মতো খুব সহজ। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে টার্কি পালন-ব্যবসা করে ভালো মুনাফা অর্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। একটুখানি সচেতনতা, সরকারি গবেষণা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক অংশগ্রহণে এ টার্কিই হয়ে উঠতে পারে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যম। এমনকি ব্যপক উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উপায়।

অধিবেশন-৪ টার্কির রোগবালাই

রোগবালাই : টার্কি পাখির তেমন বড় কোনো রোগবালাই নেই। চিকেন পক্সের টিকা নিয়মিত দিলে এ রোগ এড়ানো সম্ভব। অতি বৃষ্টি বা বেশি শীতের সময় মাঝে মাঝে ঠান্ডা জনিত রোগ দেখা যায়। তবে নিয়োমিত টিকা দিলে এসব রোগ থেকে সহজেই টার্কিকে রক্ষা করা যায়।

টিকাপ্রদান সূচি :

এক দিন বয়স- এনডি-বি১ স্ট্রেইন

৪র্থ ও ৫ম সপ্তাহ- ফাউল পক্স

৬ষ্ঠ সপ্তাহ - এনডি-(আর২বি):

১০-৮ সপ্তাহ - কলেরা ভ্যাকসিন

ব্যাকহেড ডিজিসঃ ব্যাকহেড হিস্টোমোনাস মেলিয়াগ্রিডিস নামক এককোষী পরজীবীর কারণে হয়। ব্যাকহেড অপেক্ষাকৃত নিরীহ স্যাকাল কৃমি (হিটারাকিস) দ্বারা বাহিত হয়। হিটারাকিস কৃমির ডিম কেঁচো দ্বারা বহন করে যা ১২ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ব্যাকহেড মুরগি, পাখি এবং টার্কিকে প্রভাবিত করবে কিন্তু মুরগির তুলনায় টার্কি এবং পাখির সংক্রমণের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

লক্ষণ সমূহঃ

- ব্যাকহেড রোগে আক্রান্ত পাখিরা সাধারণত পালকহীন হয় এবং তাদের ডানা ঝাপসা, পালকহীন, এবং হলুদ বোঁটা থাকে।
- যখন টার্কি ব্যাকহেড দ্বারা সংক্রমিত হিটারাকিস কৃমির ডিম গ্রহন করে, তখন ব্যাকহেড অন্ত্রের মধ্যে বেরিয়ে আসে এবং সিকাল প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ এবং ডায়রিয়া সৃষ্টি করে।
- পরবর্তীতে পরজীবী পেট থেকে লিভারে স্থানান্তরিত হয় যার ফলে পরজীবী লিভারে অনেক ক্ষতি করে এবং সাধারণত মৃত্যু ঘটায়।
- সাধারণত, সংক্রামিত পাখির সিকাম এবং লিভার ফুলে যায় এবং আলসার তৈরি করে।
- অল্প বয়স্ক পাখি দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সাধারণত লক্ষণ দেখা দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। বয়স্ক পাখিদের মধ্যে এই রোগটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং তারা প্রায়শই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাঃ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হল এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড ফ্লু) ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রমণ, যা পাখির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। বিশ্বব্যাপী বন্য পাখি তাদের অন্ত্রের মধ্যে ভাইরাস বহন করে, কিন্তু সাধারণত অসুস্থ হয় না। যাইহোক, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা পাখিদের মধ্যে খুব সংক্রামক এবং মুরগি, হাঁস এবং টার্কিসহ কিছু গৃহপালিত পাখির অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভাইরাসটি পাখি থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করতে পারে, যার ফলে প্রাণঘাতী সংক্রমণ ঘটে।

লক্ষণঃ বার্ড ফ্লুর লক্ষণ এবং লক্ষণগুলি সংক্রমণের দুই থেকে সাত দিনের মধ্যে শুরু হতে পারে, এটির ধরন অনুসারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এগুলি প্রচলিত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো, যার মধ্যে রয়েছে: কাশি, জ্বর, পেশী ফুলে যাওয়া, নিঃশ্বাসের দুর্বলতা, ডায়রিয়া এবং কিছু ক্ষেত্রে, হালকা চোখের সংক্রমণ রোগের একমাত্র ইঙ্গিত।

ফাউলপক্স (Fowlpox) মুরগি এবং টার্কির একটি বিশ্বব্যাপী ভাইরাল সংক্রমণ। পালকহীন ত্বকে নোডুলার ক্ষতগুলি ত্বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নডিউল আকারে লাল রং এর রেস বের হয়, যা উপরের অন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করে, মুখ থেকে খাদ্যনালী এবং শ্বাসনালীতে ক্ষত দেখা দেয়।

লক্ষণঃ ওয়াটল, চোখের পাতা, মুখ এবং পায়ে স্ক্যাব বা ওয়ার্টের মতো ক্ষত, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া এবং চোখ বন্ধ করা বা খসখসে করা, মুখে হলুদ ক্যানকারের ক্ষত, ওজন কমা, ক্ষুধামান্দ্য।

ক্রোনিক রেপিরেটরি ডিজিসঃ সিআরডির লক্ষণগুলো হলো ডাঁকানো, হাঁচি, কাশি এবং শ্বাসকষ্টের অন্যান্য লক্ষণ। সন্দেহ হলে, লক্ষণ সম্বন্ধে ভালো ধারণা পেতে দূর থেকে পাখিদের পর্যবেক্ষণ করুন কারণ পাখির একবার ধরা পড়লে আর বড় হয়না।

ক্লিনিকাল লক্ষণ সমূহঃ সংক্রামিত সাইনাস এবং বায়ু থলি সংক্রামণ, নিউমোনিয়া, ডিমের উৎপাদন হ্রাস। টার্কি সংক্রমণের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, যখন মুরগী কখনও কখনও লক্ষণ না দেখিয়ে এই ব্যাকটেরিয়া বহন করে। পাখি থেকে পাখির সংস্পর্শে বা সংক্রামক শ্বাসযন্ত্রের নিঃসরণের সাথে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘাস চাষ প্রদর্শনী প্যাকেজ

অধিবেশন-১ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘাস চাষের গুরুত্ব ও জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রাণী খাদ্য একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে প্রাণিসম্পদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে শস্য উপজাতই প্রধান। যেমন- ধান, গম, ভূট্টা, ডাল প্রভৃতিকে পেয়ে থাকি এবং এগুলো গবাদি পশুরখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত উপজাতের খাদ্যমান খুবই কম, যা গবাদিপশুর দৈহিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, প্রাণিসম্পদ থেকে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য কাঁচা ঘাসের কোন বিকল্প নাই। প্রাপ্য তথ্য ও উপাত্ত অনুসারে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের গবাদিপশুর জন্য কাঁচা ঘাস প্রাপ্যতা মাত্র ২.০ থেকে ২.৫ কেজির মত; যা বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন- রাস্তারপার, অনাবাদি জমি, বাড়ীর আশপাশ, বাঁধ প্রভৃতি থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

লাভজনক গবাদিপশুর খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। পূর্বে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, তাই গবাদিপশু এবং ছাগল প্রতিপালননের জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে এবং গবাদিপশু থেকে আশানুরূপ উৎপাদন পেতে খামারীদের অবশ্যই উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। নীচু নদী অববাহিকায় সাধারণতঃ শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের প্রাপ্যতা বেশী আবার উঁচু এলাকায় বর্ষা মৌসুমে সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতা বেশী। তবে কোথাও সারা বছর ঘাসের প্রাপ্যতা একই রকম হয় না। অথচ লাভজনক দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য সারা বছর ঘাস সরবরাহ প্রয়োজন।

কাঁচাঘাস গবাদিপ্রাণির জন্য একটি অপরিহার্য খাদ্যোপাদান যা অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনে সহায়তা করে। আমাদের দেশে যদিও গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনেক তথাপি জমির স্বল্পতার কারণে এদের পরিমিত পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত কাঁচাঘাস নেই। রাস্তার পার্শ্বে, জমির আইলে, নদী-নালা ও পুকুর পাড়ে, খোলা মাঠে, ফসল কাটার পরে জমিতে উৎপাদিত প্রাকৃতিক ঘাসই গবাদিপ্রাণির ঘাসের অন্যতম উৎস। ইদানিং আমাদের দেশে কিছু কিছু খামারীরা উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সংগ্রহ করে ঘাস উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁদের গবাদিপ্রাণির খাদ্যের চাহিদা মেটানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, যা খুবই আশাব্যঞ্জক দিক। আরও আনন্দের বিষয় হচ্ছে সাম্প্রতিককালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক খামারীই এখন বানিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত হচ্ছেন। প্রচলিত ফসলের তুলনায় ঘাস চাষে খামারীরা অধিক লাভবান হচ্ছেন বিধায় এখন অনেক খামারীই ঘাস চাষে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

উচ্চফলনশীল ঘাসের শ্রেণীবিভাগ ঃ

১। পুষ্টি গুণাগুণ ভেদে

ক) **লিগুমিনাস** - যে কোন ধরনের ডাল বা শিম জাতীয় অধিক আমিষ যুক্ত ঘাস যেমনঃ মাটি কালাই, খেসারী, আলফা আলফা, কাউপি, অরহর।

খ। **নন-লিগুমিনাস**- সাধারনতঃ কম আমিষ যুক্ত ঘাস যেমনঃ নেপিয়ার, জার্মান, পারা, ভূট্টা, এন্ড্রোপোগন, স্প্রেনডিডা, দল ইত্যাদি।

২। মাটির ধরন ভেদে ঘাসের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ক) **উঁচু জমির ঘাস ঃ** যে সমস্ত ঘাস শুকনো বা উঁচু জমিতে চাষ হয় যেমনঃ নেপিয়ার পাকচং, নেপিয়ার, ভূট্টা, জাম্বু, ইত্যাদি।

খ) **নীচু/জলাভূমির ঘাস ঃ** যে সমস্ত ঘাস নীচু কিংবা জলাভূমিতে চাষ হয় যেমনঃ জার্মান, পারা, দল ইত্যাদি

৩। জীবনকাল ভেদে ঘাসের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ক) **একবর্ষজীবি ঘাস ঃ** যে সমস্ত ঘাস বছরে একবার নির্দিষ্ট সময়ে চাষ করা যায় যেমনঃ যে কোন ধরনের কালাই, খেসারী, কাউপি, জাম্বু,ভূট্টা ইত্যাদি

খ) **বহুবর্ষজীবি ঘাস ঃ** যে সমস্ত ঘাস সারা বছরে যে কোন সময়ে চাষ করা যায় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বেঁচে থাকে যেমনঃ নেপিয়ার পাকচং, নেপিয়ার,জার্মান, পারা, ইত্যাদি

৪। লিগুমিনাস জাতীয় ঘাসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) **ট্রি লিগুমিনাস ঃ** যেমনঃ ইপিলইপিল, ফ্লেমিজিয়া, গিরিসিডিয়া, অরহর প্রভৃতি।

খ) **মৌসুমি লিগুমিনাস ঃ** যেমনঃ খেসারী, মাটিকালাই, ধৈঞ্চা, কাউপি প্রভৃতি।

অধিবেশন-২ উচ্চ ফলনশীল স্থায়ী জাতের ঘাস চাষ পদ্ধতি

নেপিয়ার পাকচং-১ঃ নেপিয়ার পাকচং ১ (Napier Pakchong 1) একটি হাইব্রীড, দ্রুত বর্ধনশীল উচ্চ উৎপাদনশীল এবং অত্যন্ত পুষ্টি গুণ সম্পন্ন ঘাস। স্থায়ী ঘাস। এটি গবাদি পশুর জন্য একটি শুষ্ক পদার্থের পরিমান ১৫% এবং উচ্চ ক্রুড প্রোটিন সম্বৃদ্ধ। সাধারন নেপিয়ার ঘাসে যেখানে মাত্র ৮- ১২ % ক্রুড প্রোটিন থাকে সেখানে নেপিয়ার পাকচং ১ ঘাসে ১৬-১৮ % ক্রুড প্রোটিন পাওয়া যায়। নেপিয়ার পাকচং ১ একবার রোপন করলে ৬-৮ বছর ফলন পাওয়া যায়। প্রতি একর জমিতে নেপিয়ার পাকচং ১ ঘাস চাষ করে বছরে ১৮০-২০০ মেঃ টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায় অর্থাৎ এক একর জমিতে নেপিয়ার

পাকচং ১ ঘাস চাষ করে অনায়াসে ২০-২২ টি গাভীর একটি খামারের সারা বছরের কাঁচা ঘাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

নেপিয়ার পাকচং-১ ঘাসের চাষ পদ্ধতি ঃ নিম্নে নেপিয়ার পাকচং ১ ঘাসের চাষ পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হ'ল।

জমি নির্বাচন ঃ উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে না।

জমি তৈরী ঃ জমিতে ভালভাবে ২টি চাষ ও দুইটি মই দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ প্রতি একরে গোবর-৫-১০ মেঃ টন, টিএসপি- ৫০ কেজি, এমওপি - ২৫ কেজি, ইউরিয়া- রোপনের ২১ দিন পর ৫০ কেজি/একর ও ৪৫ দিন পর ৫০ কেজি/একর।

জমিতে রোপন ও সেচ ঃ লাইন টু লাইন ৪ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং ৩ ফুট। প্রতি গর্তে ২টি কাটিং ক্রস করে ৪৫ ডিগ্রী কোণে লাগাতে হয়। অধিক ফলন পাওয়ার জন্য শুকনো মৌসুমে ৭-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

কর্তনকাল ঃ ১ম রোপনের ৬০-৯০ দিন পর এবংপরবর্তীতে ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে।

একর প্রতি উৎপাদন ঃ বছরে ১৯০-২০০ মেঃ টন/একর।

পারা ঘাস (*Brachiaria mutica*) ঃ বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৭-৮ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। এ ঘাসকে জলজ ঘাস বলা যায়। কারণ ইহা পানি প্রিয় ও স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে ভাল জন্মে। তবে শুষ্ক জমিতেও পারা ঘাস উৎপন্ন করা সম্ভব। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাস।

চাষ পদ্ধতি	সার প্রয়োগ	সেচ	ঘাস কাটার সময়	কাটিং সংখ্যা	উৎপাদন
প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। হেঃ প্রতি ২৮-৩০ হাজার কাটিং প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে.মি এবং ৩৫ সে.মি.।	জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। কটিং এর পর ৫০ কেজি ইউরিয়া/হেঃ।	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।	অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কাল ৩০-৩৫ দিন পর, শীতকালঃ ৩৫-৪৫ দিন পর।	১ম বছর ৬-৭, পরবর্তী বছর গুলোতে ৭-৯ বার।	৮০-১২০ টন/হেঃ/ বৎসর

জার্মান ঘাস	পারা ঘাস	দল ঘাস

জার্মান (*Echinoclora crousgalli*) ঃ জার্মান ঘাস পারা ঘাসের মত লতা জাতীয় ঘাস। ইহা উচু, নীচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে এবং অন্য কোন ফসল বা শস্য হয় না ঐ সমস্ত জমিতে চাষ করা যায়। জমি প্রস্তুত করার সময় গোবর সার বা ফার্মজাত পঁচানো আবর্জনা সার ছিটালে ভাল হয়। ঘাস কাটার পর হেঃ প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হয়। জার্মান ঘাস উৎপাদন পদ্ধতি, ফলন এবং অন্যান্য পরিচর্যা পারা ঘাসের মত।

দল (*Hymenachne psedointerrupta*) ঃ দল একটি দেশী বর্ষজীবী জলজ ঘাস। পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘাসের বৃদ্ধি ঘটে। ইহা নীচু জলাবদ্ধ জমিতে চাষের উপযোগী। দল, জার্মান বা পারা ঘাস খামারের বর্জ্য পানি প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে সারা বছর উৎপাদন করা সম্ভব। বছরে ৫-৬ বার কাটা যায়। শুকনো জমিতে পর্যাপ্ত পরিমান জলীয় অংশ থাকলে সার প্রয়োগ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

অধিবেশন-৩ উচ্চ ফলণশীল জাতের অস্থায়ী / মৌসুমী ঘাস চাষ পদ্ধতি

ভূট্টা ঃ ভূট্টার কচি সবুজ ঘাস গবাদিপশুর জন্য যেমন পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য, ঠিক তেমনি এর দানা মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু খাবার তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। ভূট্টার জাতসমূহের মধ্যে বর্ণালী, শুভ্রা, খইভূট্টা, মোহর, বারি ভূট্টা ৫, বারি ভূট্টা ৬, প্যাসিফিক ১১, বারি হাইব্রিড ভূট্টা এবং হাইব্রিড ভূট্টা, কোয়ালিটি প্রোটিন মেইজ অন্যতম। অনেক হাইব্রিড ভূট্টার মোচা সংগ্রহ করার পরও এর গাছ সবুজ থাকে। এগুলো ভাল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বাংলাদেশে রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমেই ভূট্টা চাষ করা হয়। পঁচা গোবর, খামারজাত বা গৃহস্থালী আবর্জনা পঁচা সার প্রতি হেক্টরে ৫৫০-৬৭০ মণ জমি চাষের সময় ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি, পটাশ ৩০ কেজি জমি তৈরীর সময় দিতে হবে। বপণের ৩০ দিন পর হেক্টর প্রতি ৩৫ থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

ভূট্টার বীজ ছিটিয়ে বপণ করার চেয়ে লাইন বা সারি করে বপণ করা ভাল। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ, বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৫ সেঃ মিঃ ও ৩-৫ সেঃমিঃ গভীরে বীজ বপণ করতে হয়। ঘাস উৎপাদনের জন্য হেক্টরপ্রতি ২৪-২৮ কেজি ভূট্টা বীজের দরকার। খরা মৌসুমে প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর প্রায় ৩-৪ বার পানি সেচের প্রয়োজন হয়। সবুজ ঘাস হিসেবে ভূট্টা বপণের ৮-৯ সপ্তাহ পর গাছের রং সবুজ থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ফুল ও মোচা হওয়ার পূর্বে কাটতে হয়। সবুজ ঘাস হিসেবে হেক্টর প্রতি ৬০-৬৫ মেঃ টন ঘাস উৎপাদিত হয় এবং হাইব্রিড ভূট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে হেক্টর প্রতি দানা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৬-১০ মেঃ টন ও ৪-৫ মেঃ টন।

ওট ঘাসের চাষ পদ্ধতিঃ বর্ষজীবি শীতকালীন শস্য জাতীয় ঘাস, প্রায় সব ধরনের জমিতে এ ঘাস জন্মায়। সাইলেজ বা হে করে সংরক্ষণ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ উত্তমরুপে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাঁদামাটিতে চাষ ছাড়া রোপন করা যায়। হেঃ প্রতি ৮০-১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন।

সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কাটিং পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। সেচ ঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর। ঘাস কাটার সময়ঃ ৬০-৮০ দিন (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)। কাটিং সংখ্যা/বৎসরঃ ২-৩ বার। ঘাস উৎপাদন (টন/হেঃ)ঃ ৩০-৪০।

জাম্বু ঘাসের চাষ পদ্ধতিঃ জমিকে উত্তভাবে চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তি কাদা জমিতে চাষ ছাড়াই বীজ বপন কিংবা কাটিং (মোথা) লাগানো যায়। প্রতি হেক্টর জমির জন্য ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি, এমপি ৩০ কেজি, অথবা পর্যাপ্ত গোবর/জৈবসার/বায়োশ্লারি জমি প্রস্তুকালীন সময়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং ঘাস লাগানোর ১ মাস পরে এবং প্রতিবার ঘাস কেটে নেয়ার পরে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি করে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ১৫ থেকে ২০ দিন পর পর ও প্রতিবার ঘাস কেটে নেয়ার পরে সার প্রয়োগ কালিন সময়েও সেঁচ দিতে হবে।

বীজ বা কাটিং প্রয়োগঃ প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৭ থেকে ১০ কেজি বীজ সারিবদ্ধ ভাবে বোপন করতে হবে। কাটিং এর ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৩৫ থেকে ৪০ হাজার মোথা বপন করতে হবে। এক লাইন/সারি থেকে আর এক লাইনের দূরত্ব হবে প্রায় ৭০ সেন্টিমিটার (২৮ ইঞ্চি) এবং কাটিং এর ক্ষেত্রে এক কাটিং থেকে আর এক কাটিং এর দূরত্ব হবে প্রায় ৩৫ সেন্টিমিটার (১৪ ইঞ্চি)।

ঘাস কাটার সময় এবং সংখ্যাঃ সাধারনতঃ প্রথমবার গ্রীষ্মকালে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ দিন এবং শীতকালে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ দিন পরে ঘাস কাটা যায় এবং এর পর থেকে যথাক্রমে ৩০ থেকে ৩৫দিন এবং ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর পর ঘাস কাটা যায়। উৎপাদনঃ প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রতিবার কাটিং এ ১০০ থেকে ১৫০ মেট্রিক টন কাঁচাঘাস পাওয়া যায়।

ভূট্টা	ভূট্টা	ওট	জাম্বু ঘাস

অধিবেশন-৪ বানিজ্যিভাবে ঘাষ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব

১ (এক) বিঘা জমিতে নেপিয়ার পাকচং ঘাস উৎপাদনের আয় ও ব্যায়ের হিসাব বিবরণীঃ

চাষ ও অন্যান্য খরচ (১ম বার)

ক্রমিক	বর্ণনা	সম্ভাব্য খরচ
১	জমি চাষ (৩ বার x ৫০০/- হারে)	১৫০০/-
২	গোবর সার (৩০০০ কেজি x ১/-)	৩০০০/-
রাসায়নিক সার		
৩	টিএসপি ১৭ কেজি x ২০/-	৩৪০/-
	এমওপি ৮ কেজি x ২০/-	১৬০/-
	ইউরিয়া ১৭ কেজি x ২০/-	৩৪০/-
৪	ঘাসের কাটিং (২৩১০ টি x ১/-)	২৩১০/-
৫	শ্রমিক (ঘাস লাগানোর জন্য ৮ জন x ৫০০/-)	৪০০০/-
৬	সেচ (৩ বার x ৪০০/- হারে)	১২০০/-
৭	আগাছা দমন (৮জন x ৫০০/-)	৪০০০/-
৮	ঘাস কাটা খরচ (৮জন x ৫০০/-)	৪০০০/-
৯	ঘাস পরিবহন খরচ	১০০০/-
	মোট খরচ	২১,৮৫০/-

পরবর্তী প্রতি কাটিং এ খরচ

ক্রমিক	বর্ণনা	সম্ভাব্য খরচ
১	জমির মাঝখানে চাষ ও আগাছা দমন (৮জন x ৫০০/- হারে)	৪০০০/-
২	গোবর সার (১০০০ কেজি x ১/-)	১০০০/-
৩	ইউরিয়া ১৭ কেজি x ২০/- হারে	৩৪০/-
৪	সেচ (৩ বার x ৪০০/- হারে)	১২০০/-
৫	ঘাস কাটা খরচ (৮ জন x ৫০০/- হারে)	৪০০০/-
৬	ঘাস পরিবহন খরচ	১০০০/-
	মোট খরচ	১১,৫৪০/-

খরচের হিসাব

১। ১ম বার (১ম কাটিং) = ২১,৮৫০/-

২। ২-৫ কাট পর্যন্ত (১১,৫৪০/-x ৫ কাট) = ৫৭,৭০০/-

মোট খরচ (২১,৮৫০.০০+ ৫৭,৭০০.০০) = ৭৯,৫৫০/-

আয়

১। ১ বিঘা জমিতে ঘাস উৎপাদন (৮ টন/ কাট x ৬ বার) = ৪৮ টন

প্রতি কেজি ঘাস ৩/- হিসাবে বছরে মোট আয় (৩/-x ৪৮০০০ কেজি)= ১,৪৪,০০০/-

১ বিঘা জমিতে ঘাস চাষ বাবদ বছরে নীট আয় করা সম্ভবঃ (১,৪৪,০০০.০০ -৭৯,৫৫০.০০) = ৬৪,৪৫০.০০

অন্যের জমি লিজ নিয়ে ঘাস চাষ করলে লিজের খরচ ১০,০০০ (প্রতি বিঘা প্রতি বছর) ধরে নীট লাভ ৫৪,৭৫০ টাকা মাত্র।

এক বিঘা জমিতে জাম্বু ঘাসের আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ ব্যবসায়িক ভাবে জাম্বু প্লাস ঘাস চাষেরআয় ও ব্যায়ের হিসাব (জমিরপরিমান ৩৩ শতক)

ব্যয়ের হিসাব		আয়ের হিসাব			
ব্যয়ের ধরন	মুল্য (টাকা)	আয়ের উৎস	উৎপাদন (কেজি)	বিক্রয় মূল্য/কেজি	মোট মুল্য (টাকা)
জমি প্রস্তুত করা	২৩১০	১ম কাটিং	১৮০০	৩	৫৪০০
জমি লিজ	৪০০০	২য় কাটিং	২১০০	৩	৬৩০০
বীজ	৭৫০	৩য় কাটিং	২৪০০	৩	৭২০০
সার প্রয়োগ	২০০০	৪র্থ কাটিং	২৪০০	৩	৭২০০
সেচ	১২০০	৫ম কাটিং	২৪০০	৩	৭২০০
নিড়ানী	১৫০০	৬ষ্ঠ কাটিং	১৮০০	৩	৫৪০০
বেড়া	১০০০				
অন্যান্য	৬০০				
মোট ব্যয়	১৩৩৬০	মোট আয়	২২৯০০	৩	৩৮৭০০

মোট আয় = ৩৮৭০০ টাকা, মোট ব্যয়= ১৩৩৬০টাকা, নিট লাভ = ২৫৩৪০ টাকা।

একজন কৃষক ১ বিঘা জমি থেকে প্রায় ২৫,০০০ টাকা নেট লাভ করতে পারে।

একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী বা মোটাতাজাকরণের ষাঁড় দৈনিক মোট ২৫-৩৫ কেজি মোচাসহ তৈরীকৃত ভূট্টা গাছের সাইলেজ খেয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক ছাগল-ভেড়াকে দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি হারে এই সাইলেজ সরবরাহ করা যেতে পারে। ভূট্টা খড়ের সাইলেজ একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী ১৮-২৫ কেজি পরিমান খেতে পারে। ভূট্টার দানা গাভী, মোটাতাজাকরণের ষাঁড়, ছাগল-ভেড়ার দানাদার খাদ্যের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

সাইলেজ প্রদর্শনী প্যাকেজ

অধিবেশন-১ সবুজ ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ মৌসুম ভিত্তিক কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুম গো-খাদ্যের বিশেষ করে ঘাসের অভাব দূর করে গরুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের দেশের কৃষক সহজে ও স্বল্প ব্যায়ে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে গরুর জন্য গো-খাদ্য সরবারহ অব্যাহত রাখতে পারেন। সংরক্ষিত এ ঘাসের গুনগত ও খাদ্যমান কাঁচা ঘাসের চেয়ে বেশী।

সাইলেজ বলতে কি বুঝায়?

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। অথবা সাইলেজ হলো গাজনকৃত সবুজ ঘাস। বায়ুহীন পরিবেশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদি পশুকে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা।

অধিক উপযোগী ফডার ঃ বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরী করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরী করার জন্য সাধরণতঃ নন- লিগিউম জাতীয় সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশী উপযোগী। যেমন, ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি। লিগিউম জাতীয় ফডার যেমন, বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি কালাই দিয়ে সাইলেজ তৈরী করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন, বারশিমের সাথে ওট এবং কাউপির এর সাথে ভূট্টা মিশিয়ে অথবা খড় মিশিয়ে সাইলেজ করা যায়।

সাইলেজের উপকারিতাঃ

- সবুজ ঘাসকে রসালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়।
- সারা বছর ব্যাপী আঁশ জাতীয় পশুখাদ্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।
- সবুজ ঘাসের যেসব কান্ড সবুজ অবস্থায় গরু খেতে পারে না, সাইলেজ তৈরী কারণে উহা নরম ও খাওয়ার উপযোগী হয়।
- বর্ষা মৌসুমে কাচা ঘাস সংরক্ষণ বরা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব
- সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও সাইলেজের ঘ্রান পশুর খাদ্যের রুচি বাড়িয়ে দেয়।
- এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস

কয়েকটি সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ নাম ঃ

- নালীগুড় ঃ ৩-৪% হারে
- ইউরিয়া ঃ ০.৫% হারে
- লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% হারে
- জৈব এসিড ঃ ১% হারে
- ব্যাটেরিয়াল কালচার ঃ প্রয়োজন মত

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য

- সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ
- গন্ধ- আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ
- পিএইচ ৩.৫-৪.৫

অধিবেশন-২ সাইলেজ তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা

সাইলেজ তৈরীর পদ্ধতি ঃ সাইলোতে ঘাস দেওয়ার পূর্বে তলায় পলিথিন অথবা পুরু করে খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাত হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। সাইলেজ মোলাসেস সহ অথবা মোলসেস ছাড়াও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সুবজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ৩০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসের দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভালভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে ভাল ভাবে আট সাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে। সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন দিয়ে ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সাইলেজ তৈরীর সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিত

১। সাইলেজ তৈরীর জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫ শতাংশ শুষ্কপদার্থ (ড্রাইমেটার) থাকা প্রয়োজন।
২। নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না।
৩। উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি "সাইলেজ" এর ভিতরে প্রবেশ না করে।
৪। চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমান বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরী করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
৫। ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে।
৬। গারু, বাছুর ও শেয়াল যাতে উপরের পলিথিন নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

সাইলেজ খাওয়ানো ঃ গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্কপদার্থ গ্রহন করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমান দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় কোন কোন বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, যেখানে সাইলেজ একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমান সাইলেজ গ্রহন করে থাকে। সাইলেজ এর সংগে কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

অধিবেশন-৩ মাটির গর্ত পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরি (ব্যবহারিক)

মাটির গর্ত পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খামারীরা অতি সহজেই সাইলেজ তৈরী করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফডার ছাড়াও অপ্রচলিত ফডার যেমন মেইজ স্ট্রভার এমনকি প্রাকিতিক সবুজ ঘাস প্রভৃতিকে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যে পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস পাওয়া যায় তা এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইলেজ করা যায়।

মাটির গর্ত তৈরী ঃ একশত ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। সাইলেজের গর্তটি উঁচু জায়গায় হতে হবে, যাতে গর্তের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারনতঃ সবুজ ঘাসের পরিমানের উপর নির্ভর করে থাকে। গর্তের তলার চার কোণা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে। মাটির গর্তে ঘাস সাজানোর সময় সাইলোর চারিদিকে পলিথিন মুড়ে অথবা সাইলোর নীচে এবং চারিদিকে খড় দিয়ে মাটি ঢেকে তার উপর স্তরে স্তরে ঘাস সাজিয়ে "সাইলেজ" করলে ঘাস নিশ্চিন্তে অনেক দিন রাখা যায়। নিম্নে ২০ ফুট লম্বা একটি মাটির গর্তের সাইলো নমুনা দেখানো হলো।

অধিবেশন-৪ ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ ও ড্রাম সাইলেজ তৈরি (ব্যবহারিক)

ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ ঃ মাটির গর্ত ছাড়াও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরী করা যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগ সাইলেজ তৈরী করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি পশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে শুধু ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ব্যাগ সাইলেজ অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ব্যাগ পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাগ পরিপূর্ণ করার পর ভালভাব মুখ বেধে রাখতে হবে। ব্যাগ পদ্ধতিতে যে ধরনের সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষন করে রাখা যায়।

ড্রাম সাইলেজ তৈরী পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরী করতে বাজারে যে ১২০ লিটার অথবা এর চেয়ে বড় ড্রাম পাওয়া যায় তা ক্রয় করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন ড্রামের মুখটা গোলাকার এবং প্রশস্থ হয়। ড্রাম পরিষ্কার করে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে যাতে উহার মধ্যে পূর্বেও ব্যবহৃত কোন ক্ষতি কারক রং না থাকে।

এই পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের সবুজ ঘাস চিটাগুড় সহ অথবা চিটাগুড় ছাড়াও সাইলেজ করা যেতে পারে। চিটাগুড় দিয়ে সাইলেজ তৈরী করতে হলে সবুজ ঘাসের সংগে শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমানে পানি মিশিয়ে ইহা ঘাসের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর পরতে পরতে সবুজ ঘাস এবং চিটাগুড় মিশানো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাস অধিক কাঁচি হলে প্রতি ১০০ কেজি সবুজ ঘাসের সঙ্গে ৫ কেজি শুকনো খড় মিশিয়ে সাইলেজ তৈলী করা যেতে পারে। পরতে পরতে ঘাস ও খড় সাজাতে হবে এবং ভালভাবে পাড়িয়ে ভিতরের বাতাস যথাসম্ভব রেব করে দিতে হবে। এভাবে ড্রাম ভর্তি করে মুখের উপরে ১০-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। ঘাস সাজানো শেষ হলে ড্রামের উপর উঠে পা দিয়ে চাপ দিয়ে যতটা সম্ভব এঁটে-সাঁট করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। একটি ড্রামে ৬০-৭০ কেজি সবুজ সাইলেজ করা যেতে পারে। প্রথম দিন ড্রাম ভর্তি করে ঢাকনা দিয়ে আটকিয়ে রেখে ৫-৭ দিন পর আবার খুলে দেখা যাবে যে ড্রামের উপরের কিছুটা অংশ ফাঁকা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আরও অতিরিক্ত ১৫-২০ কেজি পরিমান কাঁচা ঘাস দিয়ে খালি জায়গা পূরণ করে ভরে দিতে হবে। ড্রাম সাইলেজ ১ বছরের অধিক সময় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সাবধানতাঃ

- ড্রামের মুখ ঢাকনা দিয়ে সুন্দর ভাবে লাগিয়ে সেলোটেপ দিয়ে এঁটে দিতে হবে যাতে বাতাস সাইলেজের ভিতরে প্রবেশ না করে।
- চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমান বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে।
- ঘাসের সহিত খড় ব্যবহার করা হলে খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়।
- ড্রামের চারপাশ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঘাসের সাথে খুব বেশী বৃষ্টির পানি থাকা বাঞ্চনীয় নয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।